জীবন নিয়ে খেলা

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪।১ কাশীপুর রোড, কলিকাতা-৩৬

প্রকাশ করেছেন—
গোপাল চন্দ্র সামন্ত
৫৪।১, কাশিপুর রোড
কলিকাতা-৩৬

মুদ্রিত করেছেন—
ব্যোমকেশ বসাক
বসাক ট্রেডিং কোং
৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৩৫

প্রচ্ছদ এঁকেছেন—
রতিশ সাহা
কলিকাতা

বাঁধাই করেছেন—
গ্রন্থনালয়
২।২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ (১৩৭১)

"...আমি বলে যাচ্ছি, তোরা চোখ বুজে অন্ধের মত মানুষের তাজা জীবন নিয়ে ধর্মের খেলা খেলতে খেলতে ধর্মের জাঁতাকলে পড়ে একদিন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবি. পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি ..."

*　　　　*

"—সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।—"

—চণ্ডীদাস

প্রথম

প্রতিমা ও ফতিমা

হিঃ···হিঃ···হিঃ······

পাগলীটা কেবলই হাসতে থাকে আমাদের পাশের বাড়ীর রাস্তার ধারের রোয়াকটার ওপর বসে।

তার কোলের কাছে একটা বছর খানেকের ছেলে। ছেলেটা এক একবার এসে ওর একটা মাই খায়। নিশ্চয়ই ওরই ছেলে।

পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওর এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা এক এক সময়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এই পাগলী, সব পাকিস্তানে যাবে। তুই যাবি ?

ওদের কথা শুনে পাগলীটা যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতেই বলে, সব পাকিস্তানে যাবে, তুই যাবি ?

হিঃ·······হিঃ·······হিঃ······

ও যত হাসে, ছেলেরা তত মজা পায় আর সমস্বরে চীৎকার করে, সব পাকিস্তানে যাবি। এই পাগলী, তুই যাবি ?

পাগলীও হাসে আর ওরাও মজা পেয়ে চেঁচায়।

-

ঘরে বসে লিখছিলাম। গোলমালে লেখা জমছিল না। বিরক্ত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ছেলেমেয়েগুলোকে ধমক দিলাম, এই, তোরা সব পাগলীটাকে অমন করে জ্বালাতন করছিস কেন রে ?

পাশের বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে "সেলু" সামনে এসে বলল দেখুন ও' দাদা, পাগলীটা আমাদের দেখলেই বলছে, সব পাকিস্তানে

যাবি। তুই যাবি ?……তাই আমরাও ওকে নিয়ে মজা করছি। যেই বলছি, এই পাগলী, পাকিস্তানে যাবি, অমনি হি হি করে হাসছে আর ঐ কথাগুলো বলছে।

ছেলেমেয়েগুলোর চেঁচামেছি শুনে মা-ও দরজার সামনে বেরিয়ে এলেন। বললেন, কি হয়েছে রে, ছেলেমেয়েগুলো কাকে নিয়ে এমন চেঁচামেচি করছে ?

আশ্চর্য। মাকে দেখেই পাগলীটা তার হাসি বন্ধ করল। বেশ ভালমানুষের মত পরনের ছেঁড়া শাড়িটার একটা আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে মা'র সামনে এসে দাঁড়াল, একটা টিনের কৌটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দুটো খেতে দাও মা।

মা সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, তোমার নাম কিগো বাছা ? পাগলীটা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল ? চুপ করে কি যেন একটু ভাবল। তার পরক্ষণেই আবার হাসতে হাসতে উত্তর দিল, ফতিমা, আমি ফতিমা।

মা'র সহানুভূতির স্বর মিলিয়ে গেল। তিনি কড়া স্বরে বললেন, তোরা বুঝি পাকিস্তানের লোক ?

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই মা আদেশ জারি করলেন, যা, যা, চলে যা তোদের পাকিস্তানে। দেশ আলাদা করেছিস, ধর্মের নামে জাত আলাদা করেছিস, এখন আবার ছাবাচ্চা নিয়ে এখানে মরতে এসেছিস কেন ? তোদের পাকিস্তানের লোকেরা ভিক্ষে দেয় না ? আমার দিকে ফিরে বললেন, চলে আয় খোকা, দোর বন্ধ করে দে।

আমি ভেতরে এলাম। মা-ই দড়াম্ করে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলেন। তবু শুনতে পেলাম, বাইরে পাগলীটা হাসছে হি হি করে, আর বারবার বলছে, সব পাকিস্তানে যাবি, সব পাকিস্তানে যাবি।

হিঃ·········হিঃ·········হিঃ·········হিঃ·······

ছেলেমেয়েগুলো আবার হৈ-চৈ করে উঠল। একবার পাগলীর ছেলেটাও বোধহয় কেঁদে উঠল।

ও কিন্তু হাসছে আর চীৎকার করছে, সব পাকিস্তানে যাবি, সব যাবি!

আমি আর লিখতে পারলাম না। কাজে বেরোবার সময় হয়েছিল। তাড়াতাড়ি স্নান করতে চলে গেলাম।

* * °

সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরছিলাম। বাগবাজারের পোলটার সামনে এসেই বাসটা বিগড়ে গেল। বাস ঠিক করে আবার চালাতে দেরী হবে বুঝে অনেকেই নেমে পড়ে হাঁটতে লাগল। আমিও নামলাম। কাশীপুর রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীর দিকে এগোলাম। হেঁটে আসতে বেশ ভালই লাগছিল।

কাশীপুর বাজারটার মোড় পেরিয়ে এলাম।

আরে, সকালবেলার সেই আধাবয়েসী পাগলী মেয়েটা যাচ্ছে না?

ঐত, ছেলেটাও কোলে রয়েছে। ঐত সেই মুখ। গালে একটা কাটা দাগ। দেখেই বোঝা যায়, মুখখানা বয়েসকালে খুব সুন্দর ছিল। দেহের গড়নও ভাল ছিল, আর রংটা ছিল বোধহয় গোলাপীলাল। ওর গায়ের রং রোদে পোড়া তামাটে হলেও এখনো ওর আগের রংএর ছোপ ওর কাপড়ের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয়।

আমার কি মনে হল। আহা, গরীব মেয়েমানুষ। মা মিছিমিছি ওকে গাল দিয়েছেন। পাকিস্তান করেছে একদল স্বার্থপর লোক, তার জন্যে ওর মত অসহায় সামান্য একটা

মেয়েমানুষের কি দোষ? হয়ত পেটের জ্বালায় মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, খেতে না পেয়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।

আমার কেমন অনুতাপ হল, হঠাৎ কেমন একটা মমতা জাগল। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পকেট হাতড়ে একটা টাকা পেলাম।

তা হোক টাকা। আমি ত বাড়ীর কাছেই এসে গেছি! এখন টাকার দরকার কি? দিয়ে দি ঐ পাগলী মেয়েটাকে।

ও আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বাবু।.........

কৈ, সকালের মত ওর মুখে পাগলের অর্থহীন হাসি ত নেই।

এমন সময়ে ওর কথায় চমকে উঠলাম, আপনি সেই বাবু বুঝি, সেই সকালে যে বাড়ী থেকে মা তাড়িয়ে দিলেন?

আমি কথা বলতে পারলাম না। টাকাটা দিয়ে মাথা নেড়ে হন্‌হন্‌ করে চলে এলাম।

রাতে খেতে খেতে মাকে সব বললাম। মা বললেন, দেখলিত, হারামজাদী পাগলের ভান করছিল। ওরা ঐরকম নানা ভাব ধরে ভিক্ষে কুড়োতে আসে। পেটের জ্বালায় ভিক্ষে করতে আসে এখানে। কেন, ওর যে বাবারা পাকিস্তান তৈরী করেছে, তারা এখন খেতে দিতে আসছে না? তবে এদেশে আসে কেন?

মা আমাকে সাবধান করে দিলেন, খবর্দার, ওদের মায়াকান্নায় ভুলবি না, একটা পয়সাও ভুল করে দিবি না। আমাদের দেশের কোন লোক ওদের দেশে গিয়ে একটা পয়সা চাইতে পারে?

মা'র কথা বড় শক্ত কথা। তাই মেয়েটার হয়ে তখন আর কিছু বলতে পারলাম না।

তার পরদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে বাগবাজারে এসে বাসটা আর খারাপ হল না কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন খারাপ হয়ে গেছে মনে হল। নিজে ইচ্ছে করেই বাস থেকে নেমে পড়লাম। কাশীপুর রোড ধরে হাঁটতে লাগলাম। কাশীপুর বাজারের মোড়ে এলাম।

ঐ ত মেয়েটা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। ঐ ত ফুটপাতের একপাশে। মনটা এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমাকে ঠিক দেখেছিল মেয়েটা। একটু হেসে কালকেরই মত শান্ত স্বরে বলল, কি বাবুজী ?

আমি পকেট হাতড়াতে লাগলাম। খুচ্‌রো আনাবারো পয়সা হাতে উঠে এল। ওকে দিয়ে দিলাম। ও হাত পেতে নিল। আমি টপ্‌ করে বললাম, তুমি ত পাগল নও, তবে কাল সকালে ভিক্ষে করতে গিয়ে অমন পাগলের ভান করলে কেন ?

মেয়েটা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, না বাবু, মাথাটা আমার সত্যিই মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়। কি করি, কি বলি, জানি না। আবার এক এক সময়ে ভাল হয়ে যাই। তাইত এখন কথা বলছি এমন করে।

আমি মায়ের কথা ভাবলাম, এও বোধহয় একরকম ভণ্ডামি।

"খোকা···খবর্দার ওদের এক পয়সাও দিবি না"······আমি সন্দিগ্ধ স্বরে বললাম, আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই মুসলমানদের মেয়ে ? কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে তা' যেন মনে হয় না।

মেয়েটা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে কি চাহনী.····অবিশ্বাসের ? ···রাগের···দুঃখের ?···

আজও আমি তা' বলতে পারি না।

তবু আমি মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললাম, তোমাকে দেখে আমার কেমন জানতে ইচ্ছে হয়, তুমি মুসলমানের মেয়ে, না হিন্দুর মেয়ে ?

আমি আমার মা'র মত রাগ করে বলছি না। তোমাকে দেখে আমার কেমন একটা সন্দেহ হয় আর মনে কষ্টও হয়। তাই বলছি।

বাবু,...

দেখলাম, মেয়েটা কাঁদছে।

ওর চোখের জলে ওকে আর সুন্দর দেখাচ্ছে না। প্রায় বুড়িয়ে এসেছে যেন। তবু কেমন একটু করুণ দেখাচ্ছে। সুন্দরের শেষটুকু বুঝি এমনিভাবে করুণ হয়ে আসে।

সেদিন বিকেলে কাশীপুর রোডের ফুটপাতের উপর মরা জীবনের একটা কাহিনী জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নোয়াখালী জেলার...গাঁয়ে বাড়ী ছিল আমাদের।

বাবা ছিলেন পয়সাও'লা গেরস্থ, চল্লিশ বিঘে ধানী জমি, পাটের জমি বিঘে পঁচিশ তিরিশ, পঁচিশ তিরিশ ঘর প্রজা। এ ছাড়া বাবা এগাঁয়ের ওগাঁয়ের মানুষকে টাকা ধার দিয়েও বেশ পয়সা পেতেন।

আমরা এক ভাই আর এক বোন। আমার বয়েস তখন প্রায় কুড়ি। গাঁয়ে এত বয়সে অবিবয়ত মেয়ে কমই থাকে। কিন্তু আমি ছিলাম। বাবার ইচ্ছে ছিল, আমার বিয়ে গাঁয়ে দেবেন না। দেবেন সহরের কোন ছেলের সঙ্গে। ছেলে শিক্ষিত হবে আর

পয়সাও'লা হবে। বাবা বিয়ের পাত্তর খোঁজেন, আমার বয়স বাড়ে।

উনিশশ' ছেচল্লিশ সালের অর্ধেক কেটে গেল। বাবা একদিন হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। বললেন, ভাল ছেলের সন্ধান পেয়েছি। ছেলে কোলকাতায় থাকে। যেমন বিদ্যে, তেমনি পয়সা। কিন্তু রূপে আমার মেয়ের সমান নয়।

বাবা আবার হাসেন। শুনে মা বলেন, দেখ, দেশের চারিদিকে-ইত এখন হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া বেধে গেল। তার চেয়ে চল, কোলকাতায় চলে যাই। বাবা এবারও হাসেন। মাকে অভয় দিয়ে বলেন, ভাবছ কেন, এ গণ্ডগোল কমে যাবে। তারপরে কোলকাতায় চলে যাব। সেখানে গিয়ে প্রতিমার বিয়ে দেব।

মা তবু বলেন, ধর যদি এ গাঁয়েও গণ্ডগোল বাধে? আমরা এখানে মাত্তর বার তের ঘর হিন্দু আর পঞ্চাশ ষাট ঘর ত মুসলমান।

বাবা নিশ্চিন্ত মনে আশ্বাস দেন, কেন দুর্ভাবনা করছ? এরা প্রায় সবাই আমার প্রজা, আর তা'ছাড়া হিন্দুদের জমিতে চাষ করে, হিন্দুদের বাড়ীতে 'মুনিষ' খেটে খায়, ওরা কি করতে গণ্ডগোল বা দাঙ্গা-বিবাদ করবে আমাদের সঙ্গে?

তারপরে গলা নামিয়ে মাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, তবু আমি চোখ বুজে বসে নেইগো. আমি ভেতরে ভেতরে জমিজমা বিক্রি করবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। মুসলমানদের পাকিস্তান হবার আগেই মোটা টাকা নিয়ে চলে যাব, প্রতিমার বিয়ে দেব, কোল-কাতায় ব্যবসা করব, সুশান্তকে লেখাপড়া শেখাবো, মানুষ করব।

বাবাও হাসেন, মা'ও হাসেন।

কিন্তু দশবার দিন কাটতে না কাটতেই বাবার আশ্বাস মিথ্যে হল, বাবার অভয়বাণী ভয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সারা নোয়াখালী জেলাতে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেল। দেখতে দেখতে দাঙ্গা বেধে গেল আমাদের গাঁয়ে পর্যন্ত।

কেবল আমাদের গাঁয়ের পঞ্চাশঘর মুসলমান নয়, আশপাশের গাঁ থেকে আরও পাঁচ ছ'শ লোক জড় হল।

তারপরে ত সে সময়ের খবরের কাগজে সবাই পড়েছেন, আর লোকের মুখে মুখে কত ঘটনার কথা শুনেছেন।

তারপরে গাঁএর তেরখানা হিন্দুর বাড়ী ওদের মশালের আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে গেল। যারা ছোটজাত বলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে সাহস করত না, তারা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্তর ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে দিল, টাকাপয়সা সোনাদানা লুটপাট করে নিয়ে গেল। জোয়ান ব্যাটাছেলেদের হাতের কাছে পেল ত মেরে ফেলে দিল, বুড়োদের ঠেঙিয়ে আধমরা করে ছেড়ে দিল আর যে বাড়ীতে যুবতী মেয়ে-বৌ পেল, তাদের না মেরে ধরে নিয়ে গেল।

অর্ধেক রাতে বাড়ী ঢুকে চার পাঁচ জনে মিলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। আমি চীৎকার করে উঠলাম, বাবা, মা, দাদা, আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষে কর।

ওরা হো হো করে হাসতে লাগল, তোর বাবা, মা, দাদাকে কে বাঁচাবে রে? চল, চল, ভাল করে বাঁচবি এবার।

এবার ওরা আমার মুখ বাঁধল, আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার! অন্ধকার! উঃ কি যন্ত্রণা! কি অসহ্য কষ্ট! মনে হত আমি যেন বেঁচে নেই। মনে হচ্ছ, আমি কত ভয়ের স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চোখমেলে সেদিন দেখলাম, একটা ভাঙ্গা ঘরে পড়ে আছি। ঘরে দিনের আলো পড়েছে।

একজন দাড়িওয়'লা বুড়ো মুসলমান আমার মাথার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে চোখ চাইতে দেখে সে বলে উঠল, আর ভয় নেই মা। এরা আর তোমাকে লুকিয়ে রেখে তোমার উপর অত্যাচার করতে পারবে না। গান্ধীজী নিজে দাঙ্গার কথা শুনে কোলকাতা থেকে আমাদের গ্রামে ছুটে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন মুসলমানদের কর্তা উজির সুরাবর্দি সাহেব। গান্ধীজী মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে আর্জি পেশ করেছেন, ভায়ে ভায়ে একসঙ্গে থাকতে হবে। হিন্দুস্তান, হিন্দুর দেশ, মুসলমানের দেশ। সুরাবর্দি সাহেব জানিয়ে দিয়েছেন, যাদের লুকিয়ে ফেলা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। গান্ধীজীর কাছে হাজির করে দিতে হবে। তাইত আমি তোমাকে গান্ধীজীর দরবারে নিয়ে যেতে এসেছি।

আমার গলায় স্বর ফোটে, কিন্তু আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই ?

—তারা কোথায় জানি না ত মা। দাঙ্গা সুরু হওয়া থেকে উনিশ কুড়িদিন কেটে গেছে। গাঁ খানার উপর দিয়ে খুনখারাপির আর লুটপাটের ঝড় বয়ে গেছে। হয়ত তারা কেউ বেঁচে নেই। হয়তো এখনো আছে। থাকলে তুমি বাবার কাছে ফিরে যাবে।

ভাবলাম, দাঙ্গায় আমিও যদি মরে যেতাম।

গাঁয়ের মাঝবরাবর ইস্কুল বাড়ীতে গান্ধীজী সভা করে বসেছিলেন। আশপাশে বসেছিল অনেক লোক, কিছু এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের হিন্দু কিন্তু অনেক মুসলমান, অনেক, ছোটবড়, জোয়ান বুড়ো।

বুড়ো আমাকে সেখানে নিয়ে এল।

দেখি, ভিড়ের মধ্যে বসে আছেন বাবা। বাবা আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলেন।

আমি কাঁদতে পারলাম না। তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে, তাকিয়ে দেখলাম ভিড়ের দিকে।

ভিড়ের ভেতর লোকগুলোকে দেখতে পেলাম। সেই জোয়ান মুসলমানগুলো, যারা সেদিন রাতে আমাকে টেনে নিয়ে গিছিল।

মনে হল, ওরা হেসে আড়ালে চলে গেল।

আমি চীৎকার করে কি যেন বলতে গেলাম কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। শুধু থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। কে একজন বলে উঠল, আপনার মেয়ে প্রতিমা এসেছে বট্‌ঠাকুর, নিয়ে যান ওকে।

বাবা উঠে এলেন। আমার আড়ষ্ট একখানা হাত ধরলেন। আমরা ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে এসে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, বাবা, মা কোথায়, ভাই কোথায় ?

কাঁদতে কাঁদতে বাবা বললেন, তোর মাকে মুসলমানরা সেদিন রাতে কেটে ফেলে দিয়েছে। তোর ভাই আর আমি পালিয়ে গিছিলাম। ভাই কোলকাতায়, মামার বাড়ীতে। গণ্ডগোল একটু কমেছে। গান্ধীজী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শান্তির জন্যে। তাইত আমি ভরসা করে এখানে ফিরে এসেছি তোকে খুঁজতে।

একটু চুপ করে রইলেন বাবা। আবার বললেন, কোলকাতায় চল, তোকে একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দেব।

আমি তবু অবুঝের মত জিজ্ঞাসা করলাম, কোলকাতার ভাই ত মামার বাড়ীতে আছে। আমাকে নিয়ে যাবে না ?

বাবা যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। একটু পরে আবার নিজেকে সামলে আস্তে আস্তে বললেন, তোর মামারা বলেছে, তাদের ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে, ইন্দিরা, ধীরা, তুই মামার বাড়ীতে গেলে লোকে ওদেরও নিন্দে করবে। সবাই জেনেছে, তোকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেছে। তুই এখানে থাকলে ওদের ইন্দিরার আর ধীরার বিয়ে হবে না।

আমি চমকে উঠলাম, বিয়ে! মনে পড়ল, দিনকতক আগে আমারও ত বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে! তবে?

বাবার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকালাম, গলায় প্রাণপণ জোর দিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, আমার বিয়ে হবে কোথা থেকে?

বাবা চুপ করে রইলেন। তারপর শুকনো গলায় বললেন, ওরা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে, ও-মেয়েকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ও-ত মুসলমান হয়ে গেছে।

বাবা আবার হু হু করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন; তুই ভাবিস নি প্রতিমা, তোকে আমি আশ্রমে রেখে দেব। সেখানে লেখাপড়া শিখবি। দেশে অনেক উদার ছেলে আছে। দেখবি, কেউ না কেউ এরপর তোকে বিয়ে করবে।

আমার মনের মধ্যে দাউ দাউ করে রাগের আগুন জ্বলে উঠল। আমি কি ইচ্ছে করে মুসলমানদের ঘরে গেছি? তবে আমার কি দোষ? কেন আমার বিয়ে হবে না? কেন আমি বাপ ভাইকে ছেড়ে অনাথ আশ্রমে আশ্রয় নেব?

আমি দুঃখ ভুলে গেলাম। জ্বলজ্বলে চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালাম।

বাবা অসহায় গলা করে বললেন, কি করব মা? গাঁ-ই বল আর সহরই বল, আমরা যে হিন্দু। হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানে

ধরে নিয়ে গেলে তার জাতধর্ম্ম কিছুই থাকে না। এখন আমি নিরুপায়। তোর মামারা কোন কথাই শুনতে চাইবে না।

আমার মনটা কেমন একটা ঘেন্নায় রি রি করে উঠল।

আমি বাবার হাত ছেড়ে দিলাম। বললাম, তুমি কোলকাতায় ফিরে যাও বাবা।

বাবা চোখ বড় বড় করে বললেন, তুই ?

আমি শক্ত গলায় জবাব দিলাম, আমি যাব না। আশ্রমে থাকব না। থাকব এখানে, এই গাঁয়ে।

বাবা চাপা স্বরে বললেন, কিন্তু এখানকার সব কিছু আমি যে এরমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছি এক্রামুল্লা মিঞাকে। এমন কি বাড়ীঘর পর্য্যন্ত। তাহলে তুই থাকবি কোথায় ?

আমি বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞানহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, মনে কর, আমাকেও ওদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছ। পার ত কিছু টাকা চেয়ে নিও। আমি চললাম ওদের কাছে। তোমার মেয়ে প্রতিমাকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেছে। সে মুসলমান হয়ে গেছে। তুমি আমাকে বাঁচাতে পারনি, মামারাও বাঁচাতে আসেনি। তবু বিনাদোষে তোমাদের সকলের কাছ থেকে ঘেন্না আর লাঞ্ছনা কুড়োব কেমন করে ? এখানে মরে যাব কিন্তু ওখানে পতিতা হয়ে বাঁচতে পারব না।

বাবা হাত বাড়িয়ে আমাকে যেন ধরতে গেলেন, প্রতিমা, প্রতিমা, মা···মা !

আমি বাবার নাগালের বাইরে চলে গেলাম। ছুটতে লাগলাম, সামনের মাঠের দিকে। পাগলের মত চীৎকার করে কাঁদতে লাগলাম, না, না, আমি যাব না, যাব না !

দম ফুরিয়ে গেল। দূরে গিয়ে একবার দাঁড়ালাম।

পেছনের দিকে তাকালাম, বাবা নেই, বাবার কান্নার শব্দও নেই। কেউ নেই?—আছে। কেবল তখনো আছে মুসলমানদের ভোগ করা জাতিচ্যুতা একটা মেয়ে আর গাঁয়ের ঐ মুসলমানরা, যারা তাকে লুট করে নিয়ে গিছিল।

হতভাগী মেয়েটা এবার নিজে ইচ্ছে করে মুসলমানদের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াল।

বুড়ো এক্রামুল্লা মিঞা ত অবাক।

তোমার বাবা যে সব বিক্রি করে চলে গেছে মা, তবু তুমি এখানে কেন গো?

আমি বললাম, আমি বাবার সঙ্গে যাব না। তোমাদের কাছেই থাকব। আমাকে আশ্রয় দেবে তোমরা?

ওরা যখন আমার ইচ্ছেটা বুঝতে পারল, তখন ওদের অবাক হবার পালা ফুরিয়ে গেল। এধার থেকে ওধার থেকে অনেকে এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

তবু বুড়ো এক্রামুল্লা বলল, তাহলে তুমি একটা কাগজে লিখে দাও,—আমি স্ব-ইচ্ছায় এসেছি মুসলমানের ঘরে। আমরা লেখাটা দেখাব ঐ মাতব্বরদের সভায়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলাম।

ওরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল,…আল্লা হো আকবর!

আমাকে ওদের মস্‌জিদে নিয়ে গেল।

অত কথা আপনি বুঝবেন না বাবু। মোটকথা আমি মুসলমান হলাম।

মস্‌জিদে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল প্রতিমা। মস্‌জিদ থেকে বেরিয়ে এল মুসলমানী ফতিমা।

ফতিমাকে 'নিকে' করল এক্রামুল্লার মেজছেলে, নুরুল্লা মিঞা। আমি হলাম নুরুল্লা মিঞার তিন নম্বর বিবি।

প্রথম রাতে নুরুল্লা হাসতে হাসতে বলল, ফতিমাবিবি, সেদিন রাতে তোমার ঐ 'খুবসুরৎ' চেহারাখানা দেখে আমিই ত ওদের সঙ্গে তোমাকে ধরে আনি। যা হয়ে গেছে, তাতে কিছু দুঃখ কোর না তখন তুমি ছিলে হিঁদুর মেয়ে। এখন আমি ত তোমাকে মুসলমানী করেছি, আমার বিবি করেছি। হিঁদুকে মুসলমান বানালে খোদা তাকে বেহেস্তে পাঠান। আমরা দু'জনেই বেহেস্তে যাব।

আমি শিউরে উঠলাম। তাহলে এই লোকটাই আমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছিল? হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানী করে ধর্মসঞ্চয় করেছে বলে গর্ব করছে?

আমি চাপা একটা প্রতিহিংসার দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখলাম।

নুরুল্লা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, দেখছ কি ফতিমা বিবি, হিঁদুর মেয়ের পেট থেকে মুসলমানের ছেলে পয়দা হবে। গাঁয়ে মুসলমান বেড়ে যাবে। ওরাই আবার একদিন হিঁদুর মেয়ে টেনে আনবে। পানিতে পানি পড়ে পানি বেড়ে যাবে। তাহলে এদেশে পাকিস্তান কায়েম হবে। সবাই মুসলমান বনে যাবে।

আমি চমকে চমকে উঠি, তবে কি আমার পেটে যেটা এসেছে, ওটা বড় হয়ে ঐ নুরুল্লা মিঞারই মত নিজের ধর্মের লোক বাড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষটাকে পাকিস্তান করবার জন্যে আমার মত হিন্দুর মেয়ে লুট করে আনবে? মুসলমানে ধর্ম নষ্ট করেছে বলে হিন্দুরা ফেলে দেবে আর এরা কুড়িয়ে এনে তাদের পেট

থেকে নতুন মুসলমান জন্ম দিয়ে দেশটাকে ভরিয়ে দেবে? মুসলমানরা অনায়াসে হিন্দুর দেশকে পাকিস্তান করবে? বাংলাদেশ পাকিস্তানে চলে যাবে?

আমি ভাবতে পারতাম না আর। একটা হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে নিজের পেটটাকে দেখতাম।

একটা বেরোল।...ছ'তিন বছর বাদে পঞ্চাশ সালে আর একটা বেরোল।

তখন ওদের পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, তখন পাকিস্তানে আবার নতুন করে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে।

পাকিস্তানে কেন হিন্দু থাকবে? হিন্দুর মেয়েই বা থাকবে কেন?

নুরুল্লা আমাকে শুনিয়ে বলে, আয় খোদা, "ক্যাজেটা" যদি আর পনের ষোল বছর বাদে হত, তখন তোমার ছ'ব্যাটা নিয়ে আমার ছ'ছটা মরদবাচ্চা হত। ছ'টা মুসলমানের বেটা ছত্রিশটা মেয়ে ঘরে আনত। ছত্রিশটা মেয়ের পেট থেকে কতগুলো মুসলমান পয়দা হত বলত বিবি?

ঠাট্টা করে নুরুল্লা আবার হো হো করে হাসতে লাগল। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, এখন আর সবাই আমার মত মুসলমানের বিবি হচ্ছে না। অনেকে ফিরে যাচ্ছে, অনেক হিন্দুর ছেলে তাদের বিয়ে করছে।

নুরুল্লা আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল, তোবা, তোবা, অমন কথা বোল না ফতিমা বিবি। খোদার কাছে গুনাহ হয়। মুসলমান বাড়বে, হিন্দু কমে যাবে, তবে ত হিন্দুস্তানে পাকিস্তান কায়েম হবে।

ইয়ে আল্লা, রসুল্লাল্লা,...নুরুল্লা হাত ছ'টো নিচে নামিয়ে

নমাজ করবার মত হাঁটু গেড়ে বসল। সেদিনও আমি শিউরে উঠলাম।

মনে হল, আমার চোখের সামনে আসেপাশে, কাছে, দূরে মুরুল্লা মিঞারা নমাজ করছে। আবার একবার মনে হল, ওরা মুরুল্লা নয়, তবু মুরুল্লার মত দেখতে।

ওরা আজকের চেয়ে অনেক বড়, অনেকখানি ছড়ান বিরাট একটা পাকিস্তানের মুসলমান।

আমি ভয়ে চোখ বুজলাম। তবু যেন দেখলাম, আমার পেটের ছেলে দুটো, হবিবুল্লা আর এনায়েতুল্লা, হিন্দুদের দুটো যুবতী মেয়েকে ধরে এনেছে। ওদের ধর্ম নষ্ট করছে।

আমি একটা চাপা চীৎকার করে চোখ বুঝলাম। মুরুল্লা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ও আমার হাত ধরে বলল, শোবে চল বিবিজান, রাত অনেক হয়ে গেল যে।

আমরা শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই জোরে জোরে নাক ডাকতে লাগল মুরুল্লার। আমার চোখে কিন্তু ঘুম এল না সে রাতে। বরং চোখদুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল,...আমি মুসলমান হয়েছি। তবু আর কোন মেয়েকে মুসলমানের ঘরে আনবার সুযোগ দেব না। দেব না ঐ হবিবুল্লা আর এনায়েতুল্লাকে আর দুটো হিন্দুর যুবতী মেয়ের সর্বনাশ করতে, ধর্ম আর জাত নষ্ট করতে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। সেদিনই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম, এরা আমার কেউ নয়; মুরুল্লা আমার মরদ নয়, ঐ মেঝের উপর শুয়ে আছে হবিবুল্লা আর এনায়েতুল্লা, ওরা আমার ছেলে নয়। ওরা আমার শত্তুর, হিন্দুর যুবতী মেয়ের যম,...ঐ মুরুল্লার দল, ঐ হবিবুল্লা আর এনায়েতুল্লার ঝাঁক।

শত্রুরের উপর আবার মায়া কি? বিষগাছ আর বিষের চারাকে সুযোগ পেলেই উপড়ে ফেলে দিতে হবে।

সত্যি সত্যি সেই রাতে আমার মাথাটা টপ্ করে খারাপ হয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে খাট থেকে নামলাম। ঘরের দেওয়ালে একটা দড়িবাঁধা ধারাল বড় কাটারি ঝুলছিল। আমি গিয়ে ওটাকে দড়ি থেকে খুলে হাতে নিলাম।

বাপের আর ছেলেদুটোর মুণ্ডগুলো আলাদা হয়ে পড়ে রইল। ফতিমাবিবি নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

তারপর ঐ অন্ধকারে ঢাকা গভীর রাতে ছুটতে লাগলাম··· মাঠের উপর দিয়ে, পথের উপর দিয়ে।

কখন ভোর হয়ে এসেছে, খেয়াল করি নি। খেয়াল হল তখন যখন দেখলাম, সকালের আলোয় নোয়াখালির জাহাজ ঘাটার সামনে বসে আছি। বুঝতে পারলাম, মামার বাড়ী যেতে এখানে কতবার এসেছি, তাই পা দুটো আমার আনমনা অবস্থায়ও আমাকে এখানে এনে হাজির করেছে।

সেখানে আরো দলে দলে লোক এসে বসে আছে। ওরা হিন্দু। বুঝলাম, পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার কবল থেকে বাঁচবার জন্যে কোলকাতা চলে যেতে চাইছে।···

কোলকাতা!

মনটা কেমন তেজী হয়ে উটল। জাহাজ এসে গেল। অনেকের সঙ্গে জাহাজে উঠে বসলাম। গোয়ালন্দ ঘাটে এসে আবার রেলে উঠলাম। গাড়ী বিকেলে পাকিস্তান হিন্দুস্তানের বর্ডারের কাছে এল। পাকিস্তানের মুসলমানদের 'আনছার বাহিনী' গাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ল। হিন্দুযাত্রীদের জেরা করবার জন্যে ওদের মালপত্তর টেনে নিয়ে গেল, কোন কোন যাত্রীকেও ধরে টেনে নিয়ে গেল।

মাথাটা আমার যেন কিছুক্ষণের জন্যে ভাল হয়ে গেল। ওরা কাছে আসতেই পিঠের বোরখাটা মাথায় টেনে দিয়ে আমি কাঁদ কাঁদ স্বরে বললাম, মিঞাসাহেব, আমি মুসলমানের মেয়ে, আমার মরদ কোলকাতায় জাহাজঘাটায় কাজ করে। তার বড় বেমারি হয়েছে। সে কোলকাতায় হাসপাতালে আছে।

ঠকল আনছার বাহিনী। তবু জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তুমি যাবে সেখানে বিবি? শুনেছ ত, পাকিস্তানের গণ্ডগোল হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি তবু মনে প্রাণপণ শক্তি এনে বললাম, আমার জন্যে ভেব না মিঞা। জানি আমি মুসলমানের মেয়ে, তবু আমি সাবধানে থাকব। শিয়ালদা থেকে খোঁজ করে আগে মুসলমান পাড়ায় যাব। তারপরে হাসপাতালে যাব।

ওদের মধ্যে একজন একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিয়ে বলল, শিয়ালদা থেকে রাজাবাজারে যাবে। লোককে বলবে, আবদুল খাঁর হোটেল। ওরা দেখিয়ে দেবে। হোটেলের মালিক আবদুলকে সব বলবে। আবদুল লোক ভাল, তোমার সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তাহলে এরা বিশ্বাস করেছে। তাই ত কোলকাতা সহরের হিন্দুদুশমনদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আবদুল খাঁর সন্ধানটা দিয়ে দিল। আবার ঐ আনছার বাহিনীই আমাকে বর্ডার পার করে দিল।

হিন্দুস্তানে এসে কথা পালটিয়ে বললাম, আমি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে। আমি কোনরকমে এখানে পালিয়ে এসেছি।

তারপর নির্বিবাদে শিয়ালদাতে এলাম। গাড়ী থেকে নামলাম।

কোথায় যাব এবার ?

কোলকাতায় ত আপনার বলতে ভবানীপুরে মামারা আছে। কিন্তু মামার বাড়ীতে মুসলমানের ঘরে যাওয়া মেয়ের প্রবেশ নিষেধ। তাদের জাত আছে, ধর্ম আছে, সমাজ আছে। প্রতিমারও এককালে ওসব ছিল কিন্তু ফতিমার নেই।

মেয়েদের কোন আশ্রমে ?····না, ওখানে থাকতে মন চায় না। ওদের অত দয়া সহ্য হবে না।

ঐ ত ইষ্টিশানের আশেপাশে কত হাজার হাজার লোক ঘর-সংসার পেতে বসে আছে। ওরা হিন্দুস্তানে এসেও প্লাটফর্মে ঘর করেছে। ওদের সঙ্গে গিয়ে থাকিনা ?

না····একলা মেয়েমানুষ। যখন কোন দায় নেই, তখন ভাবনাও নেই। ওদের মধ্যে ঐ চাতালের রেলিংঘেরা খাঁচার ভেতর মরে মরে বেঁচে থেকে লাভ নেই।

তবু একটা যেন শঙ্কা জাগে। ফতিমা ত এখনো প্রায় যুবতী। মাত্তর চব্বিশ বছর তার বয়েস।

মন হেসে উঠল, যুবতী প্রতিমার ভয় ছিল কিন্তু ফতিমার আর কোন ভয় নেই। জাতধর্ম ত দিয়েছে চার বছর আগে, আর এরপর কিছু দেবার নেই।

শরীরটা ?···আপনমনে হেসে উঠল ফতিমা।

যদি এখানে বাঁচবার আর কোন পথ না পাই, তাহলে এখন এই শরীরটাইত বড় পুঁজি।

হাসতে হাসতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, কোলকাতায় লাখ লাখ হিন্দুর বাড়ী। হিন্দুর দরজায় একটা পেট ভিক্ষে করে বেশ চলে যাবে। পারিত ঝিগিরি যোগাড় করে নেব কোন বাড়ীতে।

কেমন সাহস হল। মনে ভরসা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় এবাড়ী সেবাড়ীর দরজায় দরজায় ঘুরলাম। দু'টো খেতে দাও মা, ভিক্ষে দাও মা।

দুপুরের মধ্যেই দেখি চালে কোঁচড় ভরে উঠেছে। দু'চার বাড়ীতে রুটি পেলাম, এক বাড়ীর মানুষে ভাত দিল। খেতে খেতে ওদের মনে রসান দিয়ে গল্প বললাম, পাকিস্থানে আমার সব ছিল স্বামীপুত্তুর ছিল, মুসলমানরা কেটে ফেলেছে। তাই একবস্ত্রে কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

আঁচলে আর হাতে দু'চারটে পয়সাও পড়ল। কিন্তু দিন শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যে আসতে বিপদ বুঝতে পারলাম।

বাড়ী বাড়ী রাতের মত আশ্রয় চাইলাম। কেউ থাকতে দিল না। সবাই এককথা বলল, তোমার জাতধর্ম গেছে বাছা, এখানে থাকতে দেব কেমন করে বল? তাহলে পাঁচজনে কি বলবে!

সহানুভূতি পেলাম, শুধু পেলাম না আশ্রয়

হিন্দুর মেয়ের একটা নিরাপদ আশ্রয়।

রাত্তির হয়ে গেল, কতক্ষণ এ-পথে ও-পথে ঘুরলাম। শেষে নিরাশ হয়ে রাস্তার ফুটপাতের একপাশে বসে রইলাম।

পথ দিয়ে কত লোক যাচ্ছে। যুবতী প্রতিমাকে দেখছে, চকচকে চাহনী!

কে একজন যেন বলল, মাগীর চেহারাখানা বেশ লাগসই। ডাকনা ওকে……, আরে ওরা এইজন্যেইত এত রাতে ভালমানুষ সেজে রাস্তার ধারে ভিক্ষের ছুঁতো করে বসে লোক টানে, আসলে দু'টো পয়সা কামাতে চায়।

কতকগুলো খিলখিল হাসি!……

তবে আর নুরুল্লামিঞার দোষ কি?

মুসলমানের কাছে ধর্ম নষ্ট হয়েছে বলে ওদের সংসারে ঢুকতে দেবে না, বাড়ীতে থাকতে দেবে না কিন্তু আড়ালে টানলে দোষ হবে না. ওদের ধর্ম নষ্ট হবেনা। এই রাতের অন্ধকারে ওদের ধর্ম ঠিকই থাকবে।

তবে ত এরচেয়ে মুসলমান ভাল। ওরা হিন্দুর মেয়ের ধর্ম নষ্ট করে কিন্তু নিজের ধর্মের মঙ্গল হবে বলে তাকে আশ্রয়ও দেয়। থাকবার, খাবার জায়গা দেয়। তাকে ভোগ করে, তবু নিজের সমাজের একটা ভাগও দেয়। কিন্তু যে নিষ্পাপ হিন্দুর মেয়ে হিন্দুর পুরুষের অক্ষমতার জন্যে মুসলমান হয়ে যায়, তাকে ঐ হিন্দুরা কুকুর শেয়ালের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

তবে কেন ফুটপাতে বসে আছি? এতরাত পর্যন্ত কিসের আশায় বসে আছি? .....

কেউ হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাবে না। বলবে না, তুমি ধর্ষিতা, তবু হিন্দুর মেয়ে। এস, হিন্দুর ঘরে এস।

তবু যদি এখনে বসে থাকি, তাহলে রাস্তা নির্জন হয়ে এলে ধরবে ওরা। ওই চক্‌চকে দৃষ্টিদিয়ে দেখছে যারা।

তবে কেন ওদের রাতের শিকার হবার জন্যে বসে থাকব? একটা পেটের আবার ভাবনা কি? দিনের বেলা ভিক্ষের পথ-ত খোলা আছে। কেবল রাতের একটা থাকবার জায়গা। রাতের আস্তানা।

তবে ওদের আস্তানায় রাত কাটাতে যাব না। কক্ষনো না। তাহলে রাতে যাব কোথায়? থাকব কোথায়? মনে পড়ে গেল আবদুলখাঁর হোটেলের কথা। ঠিকানাটা আচলে তখনো বাঁধা ছিল।

খুলে দেখলাম।

·······বরং ওদের কাছেই থাকব। ওরা ধর্ম নষ্ট করেছিল, ত আশ্রয়-ত দিয়েছিল। আদর করেই দিয়েছিল। একটা জাতিচ্যু মেয়েকে ঘরে তুলে ওদের ধর্মের মর্যাদা বাড়িয়েছিল। তবে এদে চেয়ে ওরাই ভাল।

উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে রাজাবাজারে এলাম ঠিকানাটা দেখিয়ে, একে ওকে জিজ্ঞেস করে করে হোটেলে সামনে এসে হাজির হলাম।

আবদুল খাঁর কাছে আবার নতুন গল্প বানালাম, আমার ম ডকের ক্রেন থেকে পড়ে মরে গেছে। এখানে আর কেউ নেই ওর হোটেলে শুধু রাতে থাকতে চাই। আমার পেটের জন্যে ভাব হবে না। দিনের বেলা ভিক্ষে করে নিজের খানা যোগাড় করে নেব

আবদুল খাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস। তবু দেহটা বে আঁটশাট।

খাঁ সাহেব হাসতে হাসতে বলল, রাত হলেই চলে এস বিবি তোমার জন্যে হোটেলের দরজা খোলা থাকবে। কিন্তু দিনে রোজগারের ভাগটা আমাকে দিতে হবে। রাজী?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কোঁচড় থেকে চালগুলে ওর ঘরের একটা গামলায় ঢেলে দিলাম। আবদুল খলখল ক হেসে উঠল, তোবা তোবা মেরি জান। তবে ত তুমি আমা আমি তোমাকে কালই নিকে করব। রাতে এখানে থাকব দিনের বেলা হিঁদুর বাড়ী থেকে চাল, পয়সা নিয়ে আসবে?

আমার হাত ধরে পেছনের একটা ঘরে নিয়ে গেল। আব বলল, আজকাল হোটেল তেমন চলছে না, গণ্ডগোল দেখে অনে মুসলমান পাকিস্তানে ভেগেছে। নইলে তোমায় এই বয়ে হিঁদুর বাড়ীতে ভিক্ষে করতে পাঠাতাম না বিবি।

আমি থাকবার আশ্রয় পেলাম। আবার মরণ পেলাম। আবদুল খাঁর নিকে করা বিবি হলাম।……

বেশ জীবন। নতুন লাগল। দিনে মুসলমানের কবলে ধর্ষিতা হিন্দুর মেয়ে,—চাল ডাল পয়সা দুটো একটা ছেঁড়া শাড়ী। রাতে আবদুল খাঁর আদর। বিবিজান বড় খুবসুরৎ। মেরি ফতিমা বিবি!

পাঁচ বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। ফতিমা বিবির আবার দু'টো বাচ্চা হল। একদিন আবদুল বলল, বিবি, হোটেলে আর আগের মত খদ্দের জোটে না। আমারই পেট চলে না, তা লেড়কা দুটোর বাত ত ছেড়েই দাও। আমি বলি কি, বড় লেড়কা সামাদকে বড়াবাজারের মস্‌জিদে পাঠিয়ে দি। ওরা দানাপানি দেবে আর কেতাব উতাব পড়াবে।

আবদুল খাঁ ত হেসেই অস্থির। হাসি থামতে আবার বলল, আউর ফতিমাবিবি ছোটা লেড়কাকে সাথমে রাখবে। হিঁদুর বাড়ী থেকে দুধ খাওয়াবে। বাচ্চা বড় হবে, মসজিদে যাবে। যখন এত বড় মরদ হবে, দাঙ্গা হলে ঐ হিঁদুদের জরু ধরে আনবে, হিঁদুর জরুকে মুসলমানী বানাবে, সাদী করবে।

প্রতিমা মনে মনে চমকে ওঠে! এখানে একটু আশ্রয়ের বদলে আবার দুটো শয়তান তৈরী করব? তারা বড় হবে, দাঙ্গা বাধলে আবার হিন্দুর মেয়ে ধরে আনবে, সাদী করবে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়াবে? তবে নুরুল্লা আর তার ছেলে দুটোকে মেরে হিন্দুস্থানে চলে এলাম কেন?

ভেতরে প্রতিমা শিউরে ওঠে, তবু ফতিমা বাইরে হাসে। আবদুলকে বলে, আচ্ছা, আজ ত দুটো লেড়কা আমার সঙ্গে যাক। কাল না হয় মস্‌জিদে পাঠাবে।

দুটোকেই নিয়ে যাই। একটা হাত ধরে ধরে যায়। একটা কোলে উঠে যায়।

কিন্তু প্রতিমা আবার পাগল হয়ে যায়। ছেলে নয় এ দুটো দুটো শত্তুর। হিন্দুর যুবতীমেয়ের শত্তুর।

নুরুল্লার দেওয়া শত্তুর দুটোকে শেষ করে এসেছি। আজ এ দুটোকেও শেষ করব।

আমি ফতিমা নই,······ধর্ষিতা প্রতিমা। মা নই,······ রাক্ষসী! বিষের চারাকে মুড়িয়ে দেব, শত্তুরের শেষ করব। সেদিন রাত করে হোটেলে এলাম।

বাগবাজার পোলের কাছে এসে সামাদকে পোলের রেলিংএর উপর তুলে দিলাম। ছেলেটা নোতুন খেলা পেয়ে রেলিং ধরে ঝুলছে। আমি এদিক ওদিক তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। পেছন থেকে একটা ধাক্কা দিলাম। একটা চীৎকার উঠল। জলের মধ্যে ঝপ্ করে শব্দ হল।

আমি ছোটটাকে কোলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। কাঁদতে কাঁদতে আবদুলকে বললাম, সামাদ খালের ধারে খেলতে খেলতে জলের মধ্যে ডুবে গেছে।

আবদুল দু'চার জন সঙ্গী নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। শেষ রাতে ওরা ফিরে এল। শুনলাম, পুলিশে লাশ তুলেছে। বিকেলে ফেরত দেবে।

আবদুলের সে কি ভীষণ মূর্তি! আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

শয়তানী, তুই ছেলেটাকে ফেলে দিয়েছিস।

চুলের মুঠি ধরে সে কি চোরের মার,········নিকালো হিঁয়াসে নিকালো বেইমান!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল প্রতিমা। একটা কথাও বলল না।

আবদুল খাঁ গিয়ে হোটেল খুলল। ফাতিমা ভিক্ষেয় যাবার জন্যে পা বাড়াল। আবদুল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ছোটা বাচ্চার কুছু হলে তোর খুন দেখব। শয়তানী! লেকিন তুই দুধ মেঙ্গে ওকে জরুর খাওয়াবি। গড়বড় হলে ধাক্কা মেরে বার কোরে দেব।

সে দোকান থেকে উঠে এসে আমার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিল। ছিট্‌কে রাস্তায় এসে পড়লাম ফুটপাতের কোনায় ধাক্কা লেগে গালটা কেটে গেল। হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। হাত বেয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

হোটেলে একজন চা খেতে এসেছিল। সে বললে, কি করলে সর্দার, অমন মুখখানা দাগী করে দিলে!

আবদুল খিঁচিয়ে বলল, আচ্ছা করেছি। শয়তানী মুসলমানের লেড়কাকে খুন করেছে। আবার আজকাল রাত করে বাড়ী আসে। কি জান দোস্ত, লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দুবাবুদের সঙ্গে আসমানী করে আসে।

আমি রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল দিয়ে কপালটা চেপে ধরে পথ চলতে লাগলাম। ছেলেটা তখনো বুকের উপর লেপ্টে রইল। মনে হল, ওটাকেও এই রাস্তায় আছড়ে মারি, মরুক আর একটা শত্তুর।

তবু পারলাম না। ছেলেটাকে নিয়েই আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগলাম। আজ আর নিজেকে লুকোলাম না, আজ আশ্রয়ের জন্যে শেষ চেষ্টা করলাম। সবার বাড়ীতে মরিয়া হয়ে বললাম, আমি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানে ধরে নিয়ে গিছিল। তোমরা আমাকে একটু জায়গা দাও, মাথা রাখবার একটু ঠাঁই, এর বদলে যা বলবে তাই করব।

আজ ভিক্ষেও মিলল না। উল্টে দরজাগুলো আমার চোখের

সামনে দড়াম দড়াম শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতর থেকে বলল, কালামুখী, মুসলমানের ঘরে গিয়ে আবার ঘরে আসতে লজ্জা করে না ?

কেউ বলল, এখানে আর এস না বাছা, কে কবে বলে বসবে, একটা মুসলমানে ছোঁয়া মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

আবার কেউ বলল, ওখানেই ফিরে যাও না বাছা। আর হিন্দুর বাড়ীতে মায়া কেন ?

শেষপর্যন্ত আমি সন্ধ্যেবেলা ফিরেই এলাম। অন্যদিন তবু কোঁচড় ভরতি চাল পাই। আজ কিছুই পেলাম না।

শুধু হাতে আসতে দেখে আবদুল খাঁ ঘাড় ধরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আজ বুঝি আর সাঙ্গাৎ জোটেনি মাগী। তা' ওসব আমি বুঝি না। আমি বুঝি, যেমন করে হোক চাল পয়সা এনে দিবি। আর ঐ সামাদের বদলে আউর একটা বাচ্চা আমার চাই। না দিবি ত তোর এখানে আস্তানা নেই।

আস্তানা ! এখানে আস্তানা না পেলে আর যে কোথাও আস্তানা পাব না।

তবু এখানে চালপয়সার বিনিময়ে আছি, আছি মুসলমানের বাচ্চা পয়দা করার সর্তে। এ আস্তানা গেলে আমি আর বাঁচব না।

দু'বছরের মধ্যে আবার একটা বাচ্চা পয়দা হল। তেমনি দু'টো মুসলমানের বাচ্চা। তবু আবদুল খাঁ খুশী হল না। ফতিমার বয়েস যে সাতাশের কোটায় চলে গেছে। তার উপর সারাদিন হাঁটার পরিশ্রম।

আজকাল আবার হোটেলে ফিরে গিয়ে হোটেলের বাসনকোসনও মাজতে হয়। খেটে খেটে রূপ গেল, সেদিন আবদুলের ধাক্কায়

রাস্তায় পড়ে গিয়ে গালে কাটার লম্বা দাগ হয়ে গেল। শরীরটার রসকস শুকিয়ে গেল, এখন আবদুল খাঁ আর খুশী হয়ে আগের মত আদর করবে কেন ?

একদিন বড় ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে মসজিদে রেখে এল। ছোটটাকে আর একটু বড় হলেই রেখে আসবে। ছুটো মুসলমানের বাচ্চা বড় হবে। দাঙ্গা বাধলে হিন্দুর মেয়ে লুট করবার জন্যে ছুটে যাবে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার মাথাটা মধ্যে মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। আমি এক একদিন ভিক্ষে করতে গিয়ে পথে চাৎকার করে উঠতাম, সব ধরে নিয়ে যাবে। সব পাকিস্তানে যাবি।

প্রথম প্রথম রাস্তায় লোক জড় হত। মজা দেখত, আমায় ওরা ক্ষেপাত, এই পাগলী, তুই পাকিস্তানে যাবি ? আমি চুপ করে যেতাম। মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, আমি-ত পাকিস্তানেই গেছি। তবে চেঁচাচ্ছি কেন ?......

আস্তে আস্তে হোটেলে ফিরে আসতাম। আবদুলের হাতে মার খেতাম। তারপর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আবার বেরোতাম। আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরতাম, মাগো, ছুটো খেতে দাও মা।

কেউ দিত। কেউ জিজ্ঞেস করত, তুই হিন্দু না মুসলমান রে ? আমি নিজেকে আর চাপতাম না। সোজাসুজি জবাব দিতাম, আমি মুসলমান মা।

সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যমাখা কথা শুনতাম, যা, বেরো মাগী, তবে এদেশে কেন ভিক্ষে করতে এসেছিস ? তোদের পাকিস্তানে যা না। যারা পাকিস্তান করেছে, তাদের কাছে ভিক্ষে চাইগে না। যা, যা, বেরো।

শুনেই আমার মাথাটা দপ্ করে জ্বলে উঠত। আমি পাগলের মত হয়ে যেতাম। হি হি করে হাসতে হাসতে বলতাম, আমার মত সব পাকিস্তানে যাবি, সব পাকিস্তানে যাবি।

কেউ ঢিল মারত, কেউ তেড়ে আসত। আমি মার খেয়েও হাসতাম। পথে বসে খল খল করে হাসতাম।

সন্ধ্যের পর হোটেলে ঠিক ফিরে যেতাম। নইলে আর কোথায় যাব? আর ত কোন আস্তানা নেই, আশ্রয় নেই। আবদুল খাঁ মারে সেও ভাল, তবু ত একটা আস্তানা জুটেছে। আর কেউ দেয়নি, আবদুল খাঁ আস্তানা দিয়েছে।

এরপরও আরও তিনবছর কাটল। বয়েস আরো বাড়ল, তিরিশ পেরিয়ে গেল। শরীর ঢ্যাপ্‌সা হয়ে গেল। মুখ তো গিছিলই, দেহটাও গেল।

রাতে আবদুল খাঁর পাশে শোওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। আবদুল বলল, যা, যা, এই বুড়ো বয়সে ওই ডাইনীর মত চেহারা নিয়ে আর সোহাগ করতে হবে না। ফুটপাতে কুলীকামারি ঘুমোচ্ছে, ওদের কাছে যা। আবদুল পাশ ফিরে শুয়ে রইল। আবার এক-সময় বলল, যে মাগী মুসলমানের বাচ্চা পয়দা করতে পারে না, আবদুল তাকে ছোঁয় না। তুই এবার চলে যা।···আমার মাথাটা আবার কেমন গুলিয়ে গেল। আমি খিলখিল করে হেসে উঠলাম, আবদুল খাঁ, মুসলমানের বাচ্চা পয়দা হবে। সব পাকিস্তানে যাবি।

আবদুল খাঁ ধড়মড় করে উঠে বসল। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

সকাল হল। মাথাটা যেন আবার ভাল হয়ে গেছে মনে হল। ভিক্ষেয় বেরোলাম।

মাগো, দু'টো খেতে দাও মা। ....

বারবার কাতর মিনতি শুনে কেউ দুটো দেয়। কেউ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুমি, কাদের মেয়ে বাছা? হিন্দুর না মুসলমানের?

অমনি আমার মাথার মধ্যে দপ্ করে কি যেন জ্বলে ওঠে। বোধহয় ফতিমা বিবির মধ্যে অভাগিনী প্রতিমার ব্যর্থ-প্রতিহিংসা জ্বলে ওঠে। আমি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলি, আমি মুসলমান।

তক্ষুনি দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর গালাগাল শোনা যায়, তবে এখানে মরতে এসেছ কেন? যাও না, যারা পাকিস্তান করেছে, তাদের কাছে যাও না।

আমি তখন হাসি, খলখল করে হাসি আর কেবল চীৎকার করি, সব পাকিস্তানে যাবি, তোরা সব পাকিস্তানে যাবি।

আমার পাগলামী দেখে কেউ হাসে, কেউ বা মারতে আসে। কাল সকালেও ত আপনার মা ঐ কথা বলে গাল দিল বাবু।

ফতিমা চুপ করল। একটা ভিক্ষে করা রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছেলেটার মুখের ভেতর গুঁজে দিতে লাগল। ছেলেটা! হিন্দু-মেয়ের পেটে মুসলমানের বাচ্চা! আমার মন বল্ল, প্রতিমার মত কত হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেছে। এই অপরাধে ওরা আর কোন হিন্দুর ঘরে আশ্রয় পাবে না। আশ্রয় পাবে মুসলমানের ঘরে। মুসলমানরা ওদের আশ্রয় দেবে, ওদের 'নিকে' করবে, ওদের পেটে আরও আরও অসংখ্য মুসলমানের বাচ্চা পয়দা করবে। তারপর?.......

উনিশ্‌শ ছেচল্লিশ সালের বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সারা বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী করার কথা। মনে পড়ল, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালীর সেই ভয়ানক দিনগুলোর কথা।

তবে কি শত শত বছর ধরে প্রতিমারাই একে একে ফতিমা হয়ে গিয়ে হাজারে হাজারে লাখে লাখে মুসলমান পয়দা করছে ? ফতিমার বাচ্চারাই পাকিস্তান কায়েম করেছে ?

তবে কি এরপরেও এমনি করে বাংলাদেশের প্রতিমারা মুসলমানের ছোঁয়া পড়েছে বলে আমাদের ঘরে আশ্রয় না পেয়ে শেষে মুসলমানদের ঘরে ফতিমা হয়ে আশ্রয় পাবে। মুসলমানের বিবি হবে ! তার পেট থেকে হাজার হাজার মুসলমান পয়দা করবে ! ! ......

পাগলী ফতিমার চীৎকারটা কানে বাজতে লাগল, সব পাকিস্তানে যাবি, সব পাকিস্তানে যাবি ! প্রতিমা কি পাগলের প্রলাপ বকছে, না ধর্ম আর জাতের মান বাঁচাবার মোহে অন্ধ হিন্দুকে ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্কর পরিণামটা জানিয়ে দিচ্ছে ?

ভাল করে বুঝে উঠতে পারি না।

যে প্রতিমা আশ্চর্য শান্ত হয়ে এতক্ষণ ধরে তার মরার গল্পটা বর্ণনা করে গেল, সেই স্থির পাষাণ প্রতিমা হঠাৎ আবার কেমন অস্থির হয়ে উঠল। আচমকা খিলখিল করে হাসতে হাসতে মাটিতে শুয়ে পড়ল আর চীৎকার করতে লাগল, সব পাকিস্তানে যাবি।

আমি আর শুনতে পারলাম না।

এ যেন পাগলী ফতিমার চীৎকার নয়, যেন সেদিনের নিষ্পাপ মেয়ে প্রতিমার বুকফাটা অভিশাপ !

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। সেখান থেকে একরকম যেম ছুটতে ছুটতে বাড়ী চলে এলাম।

*　　　*　　　*

তু'দিন পরে ঘরে বসে লিখছি!

মেয়ে মানুষের গলা শোনা গেল, তুটো খেতে দাও মা। আবার মা দরজা খুলে গালাগাল দিলেন, যা হারামজাদী, দূর হয়ে যা। তোকে সেদিন বললাম না, মুসলমানের মেয়েকে আমরা ভিক্ষে দেব না। তোদের পাকিস্তানে চলে যা না!

মা'র কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার সেই খিলখিল হাসি আর পাগলের প্রলাপ ভেসে এল, তোরা পাকিস্তানে যাবি, সব পাকিস্তানে যাবি!

হিঃ······হিঃ······হিঃ······হিঃ······।

ওটা যেন হাসি নয়!

যেন ব্যঙ্গ করছে, যেন ভয় দেখাচ্ছে!

আমিও পাগলের মত ছুটে গেলাম। দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিলাম।

কানতু'টো হাত দিয়ে চেপে ধরলাম।

বাইরে থেকে ওর কথা আর শুনতে পেলাম না। কিন্তু মনের ভেতর থেকে তখনো শুনতে পেলাম, সব পাকিস্তানে যাবি,···সব পাকিস্তানে যাবি!

অবুঝ মন কিছুতেই বোঝে না।

বোঝে না যে ওটা লাঞ্ছিতা প্রতিমাদের বঞ্চনার অভিশাপ নয়, ···ওটা ঐ পাগলী ফতিমার অর্থহীন প্রলাপ।

দ্বিতীয়

সুশান্ত ডাক্তারের কথা

কিন্তু প্রতিমাকে অনেকদিন দেখতে পেলাম না।

কতদিন অফিস থেকে ফেরার পথে বাসে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছি।

কৈ, প্রতিমাকে ত আর দেখা যায় না।

এক একদিন আবার মনটাও একটু খারাপ হয়ে যেত।

এক একদিন নিজেই নিজেকে বোঝাতাম, দূর, কোথায় কে একটা মেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ সব ভেবে আমার কি লাভ! এমন এ দেশে কত মরছে, কত মরবে। আমি একলা এর কি প্রতিকার করতে পারি?

এরপর একবছর কেটে গেল। প্রতিমার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। তবু হঠাৎ একদিন আচমকা প্রতিমার মুখখানা আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেদিন সকালে চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা ওল্টা-চ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, প্রতিমার মুখের ছবি। চমকে উঠলাম।

এ মুখ আর কারো নয়। নিশ্চয় এ প্রতিমার মুখের ফটো। তার মুখের শোনা কথাগুলোর সঙ্গে তার কান্নামাখা মুখের চেহারা খানাও যে আমার ভেতরে গেঁথে আছে।

আমার ভুল হতে পারে না।

ফটোর তলার লেখাগুলো কৌতূহলের টানে তরতর করে পড়ে ফেললাম,... ....

"উপরে মুদ্রিত প্রায় তিরিশ বছরের একটি রমণীর মৃতদেহ

মেডিকেল কলেজে আজ হইতে তিনদিন সংরক্ষিত থাকিবে। যদি কেহ বা কাহারা ঐ মৃতার আত্মীয় বা দাবীদার হন, তাহা হইলে উক্ত তিনদিনের মধ্যে তাঁহাদের দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ অথবা লিখিত প্রমাণ বা অন্য যোগ্যমত কোন প্রকার প্রমাণ সঙ্গে লইয়া হাজির হইতে হইবে। উপযুক্ত প্রমাণ দেখাইয়া উক্ত মৃতদেহ পুলিশ ও হাসপাতালের হেফাজত হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা নির্দিষ্ট তিনদিনের পর মৃতদেহ বেওয়ারিশ সাব্যস্ত করিয়া পুলিশের তত্ত্বাবধানে সংকার করা হইবে।"

লেখা থেকে চোখ সরিয়ে আমি আবার ফটোটার দিকে তাকালাম।

প্রতিমা বা ফতিমা চোখ বুজে রয়েছে।

আমার কোন সন্দেহ রইলনা। কিন্তু আমার মনও আর স্থির রইল না। কেমন যেন অস্থির ভাবে উঠে পড়লাম। এঘর ওঘর ছটফট করে ঘুরে বেড়ালাম। এটায় ওটায় হাত দিলাম। কিন্তু আবার এসে একসময়ে খবরের কাগজের পাতা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

একসময় ভাবলাম, ও ফটো প্রতিমার হল ত আমার কি আসে যায়? আমার কোথাকার কে ও? আমারই বা ওকে দেখে এত চঞ্চল হবার কি কারণ আছে?

তবু মনটা স্থির হতে চাইল না। তবু বারবার প্রতিমার সেদিনের কথাগুলো মনের ভেতরে হুড়মুড় করে ছুটে এসে মনটাকে কি রকম যেন চঞ্চল করে তুলল। একবার মনে হল, প্রতিমার এই পরিণতির জন্য আমিই বোধহয় অপরাধী।

পরমুহূর্তেই আবার ভেতরে জোর আনবার চেষ্টা করে ভাবলাম, আমি কেন অপরাধী হতে যাব? অপরাধী ওরা, যারা প্রতিমাকে

বাঁচাতে পারে নি, যারা প্রতিমাকে নির্দোষ নিস্পাপ জেনেও নিজেদের সমাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, অপরাধী ঐ সব অক্ষম অথচ হিন্দুধর্মের ভণ্ডামির ধ্বজাধারী মানুষগুলো।

যাহোক একটা যুক্তি খাড়া করে নিজেকে যেন খাড়া রাখবার চেষ্টা করলাম। মনটা একটু যেন স্থির হয়ে দাঁড়াল।

আমি আর বসে থাকলাম না। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। স্নান করে নিলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে অফিস চলে গেলাম।

কিন্তু যতবার শান্ত হতে চেষ্টা করলাম, ততবারই ভেতরটাতে কি যেন একটা চাপা উত্তেজনা ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। সন্ধ্যের একটু আগে অফিস থেকে বেরোলাম।

বাসে উঠলাম। সন্ধ্যের কোলকাতা আলোর ঝলমলে গয়না পরে হাসছে যেন। বাইরের দিকে তাকাতে তাকাতে আসছিলাম। মাঝপথে হঠাৎ মনটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল। ভাবলাম, এখানে নেমে যাই। মনের কথায় সায় দিয়ে উঠে পড়লাম। বাস থামতেই তড়বড় করে নেমে পড়লাম।

নেমে কিন্তু হুঁস ফিরে এল।

এ কোথায় নামলাম! এ তো দেখছি, সামনে মেডিকেল কলেজ। এখানে হঠাৎ নামলাম কেন?

নিজের এই খামখেয়ালীপনার কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। এবার সব পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠল।

প্রতিমাকে আমি ভুলে গেছি বলে বাইরের মনকে বোঝালেও আমার ভেতরের চাপা টান তার পরিচয়টাকে আমার মনের অন্ধকার তলায় লুকিয়ে ধরে রেখেছিল। এখানে আসতেই ওটা আলগা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাই ভাল করে বোঝবার আগেই ওই অজানা টানে রাস্তায় নেমে পড়েছি।

নিজের দুর্বলতাটা মনে করে একটু হাসলাম। পরের বাসটা ধরবার জন্যে এগিয়ে যাব ভাবলাম।

আশ্চর্য! আর একটা নতুন ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে মনে এল,… নাই বা হল ঐ প্রতিমা আমার নিজের জন। ও পাগলী হয়েও তার লাঞ্ছিত জীবনের কথাগুলো চোখের জল মিশিয়ে আমার মনে ঢেলে দিয়ে গেছে। একজন মানুষ আর একটা মানুষের কাছে তার বুকের সমস্ত কান্না নিংড়ে ঝরিয়ে দিয়েছে। আর আমি কি নিষ্ঠুর অমানুষ হয়ে দেছি। আমার মন কি ওর কথাগুলো শোনবার পরেও একটুও গলেনি, এতটুকু নরম পর্যন্ত হয় নি!

প্রতিমা এই হাসপাতালেরই একটা ঘরে এখনো শুয়ে আছে। তবু কি করে এখানে এসেও ওকে এড়িয়ে আবার চলে যাচ্ছি! এই রকম নিষ্ঠুর হবার জন্যেই কি সেদিন একটার পর একটা করে তার জীবনের গল্পগুলো শুনেছিলাম?

থমকে দাঁড়ালাম। একবার একটু হাসলাম। বুঝলাম, দ্বিতীয় ভাবনাটা জিতে গেল। তবু আমি যে ঠকে যাই নি, এটা মনে মনে প্রমাণ করবার জন্যে এরপর নিজেকে বোঝালাম, দেখেই যাই না মেয়েটাকে, বেঁচে ত মরেই ছিল, দেখে যাই এখন মরার পর কেমন দুঃখ লাঞ্ছনা শূন্য হয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। একবার চোখের দেখা দেখে গেলে দোষটা কি?

মেডিকেল কলেজের দিকে এগোতে এগোতে ভাবলাম, তা'-ছাড়া, দেখেই আসি না কেন, ওর আত্মীয় পরিচয় দিয়ে কেউ এর-মধ্যে এসেছে কিনা,…ওর মরা দেহটাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। আর নেহাতই যদি কেউ না এসে থাকে, ওকে আত্মীয় বলে দাবী করবার আর কারো ইচ্ছে না থাকে, আমিই কি তবে এগিয়ে যাব?…

এক মুহূর্তের খেয়ালী উত্তেজনায় কখন যে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি, কখন যে এনকোয়ারী অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, অফিসের লোকদের কি যে জিজ্ঞেস করেছি, সে সব খেয়াল করবার হুঁস হল না। আবার হুঁস ফিরে এল তাদের কথায়, আপনি এই ফটোর অধিকারিনীর কে হন ?

চমকে উঠলাম আমি, তাইত, আমি কি বলব এখন ?

তবে কেন এলাম ?

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম।

একজন একটু যেন হাসির সঙ্গে বললেন, আপনাকে নিয়ে তিন নম্বর দাবিদার হল। বিকেলে আরো দু নম্বর এসে গেছে। একদল মুসলমান এখানকার পুলিশ অফিসারের সঙ্গে লাশ সনাক্ত করতে মড়িঘরে গেছেন। আর একজন কোটপ্যান্ট পরা বাঙালীবাবু। নিজেকে মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার বলে পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনিও পুলিশের সঙ্গে ওখানে গেছেন। আপনার পরিচয়টা লিখে দিয়ে আপনিও আর একজন দাবীদার হয়ে ওখানে যেতে পারেন। ওই যে, এই সিঁড়ি থেকে নেমে ওই সামনের বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই বাড়ীটা, ওই মড়িখানা।

উনি আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীটা চিনিয়ে দিলেন।

আমি চুপ করে রইলাম।

এনকোয়ারী অফিসের ভদ্রলোকই আবার বললেন, বেশতো, আপনি না হয় ওখানে গিয়ে আগে লাশ দেখে মিলিয়ে নিন, তারপর ওখানে যে পুলিশ অফিসার আছেন, তাঁর কাছে আপনার যা বক্তব্য বলবেন।

আমি আর ওখানে দাঁড়ালাম না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে তক্ষুণি হনহন করে মড়ি-খানার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমার মনের কৌতূহল তখন ডবল পর্দায় চড়ে গেছে। বে-ওয়ারিশ প্রতিমার দু'দল দাবীদার!

একদল মুসলমান আর একজন কোটপ্যাণ্ট পরা বাঙালী ডাক্তারবাবু! এত আপনার লোক থাকতে প্রতিমা তবে মরলই বা কেন? আর মরল কি ভাবে?

দিকবিদিক বিচার না করে মড়ি-খানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু আর ভেতরে ঢুকতে হলনা। ওদের সবাইকে দেখতে পেলাম।

মাথার টুপি হাতে নিয়ে পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। সাত আটজন লুঙ্গিপরা পশ্চিমা মুসলমান তাঁর এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের কাছথেকে হাত চার পাঁচ দূরে কোটপ্যাণ্ট-ধারী একজন বাঙালীবাবু দাঁড়িয়ে।

বুঝলাম, উনিই ডাক্তারবাবু। একেবারে আনকোরা ছোকরা ডাক্তার।

শুনতে পেলাম, অফিসার তখন বলছেন, একটা লাশের উপর দু'পক্ষ দাবী করলে আজকে লাশ খালাস করা চলবে না। এখানে আইনকানুনের ব্যাপার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাই আপনাদের অনুরোধ করছি বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে হাজির থাকতে। একজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিজের নিজের সাক্ষিসাবুদ নিয়ে হাজির থাকবেন।

মড়িখানার প্রকাণ্ড দরজাটা খোলা। কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরটা ভাল দেখতে পেলাম না। ভেতরে একটা আলো জ্বলছে বটে কিন্তু অস্পষ্ট খাটগুলোর কোনটাতে প্রতিমা চিরনিদ্রায় ডুবে আছে, তা' ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

পুলিশ অফিসারের ঘোষণা শুনে সাব্যস্ত করলাম, আর

প্রতিমাকে দেখবার দরকার নেই, প্রতিমার মরা দেহটার সদ্‌গতি করবার জন্যে দুশ্চিন্তা করবারও দরকার নেই। বেঁচে থাকতে তার জন্যে কেউ ভাবেনি সত্যি, কিন্তু তার মরা দেহটাকে নেবার জন্যে অনেক লোক উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হায়রে! প্রতিমা যদি জানত, তার মরার পর এতটা সৌভাগ্য হবে!

মনে মনে যেন বললাম, তোমার জন্যে এরা অপেক্ষা করছে প্রতিমা। তবে আর আমি থাকি কেন? চললাম। তবে একটা কথা শুনে রাখ, গোটা হিন্দুজাতটা তোমাকে মরার আগেই ভুলে গেছে কিন্তু হিন্দুর ছেলে হয়েও আমি তোমার মরার পরেও তোমাকে ভুলতে পারিনি!

আমি ঐ পুলিশ অফিসারকে কোন পরিচয় দিইনি। আর আমার পরিচয় দেবার কিইবা আছে? কিন্তু মনের পরিচয় নিয়ে আমি যদি ঐ মেয়েটার জন্যে এখানে চোখের জল ফেলি, তাহলে এরা যতটা আশ্চর্য হবে, তার চেয়ে বেশী হাসির খোরাক পাবে। বরং চটপট বাইরে যাওয়াই ভাল।

ওখান থেকে চলে এলাম। খানিকটা এগিয়ে আবার নতুন একটা ভাবনা আসতে থমকে দাঁড়ালাম। মুসলমানদের ত চিনলাম। ওঁরা হলেন ফতিমার দাবীদার। মুসলমানদের বিবিকে হাজার তাচ্ছিল্যের হলেও হিন্দুদের হাতে তুলে দেবার সুযোগ দেবেন কেন ওঁরা? এতে নিজেদের অপমান করা হবে যে, জাতের একতা নষ্ট হবে যে। তাই বেঁচে থাকতে খোঁজ করবার দরকার না হলেও মরবার পরে লাশটাকে আদায় করে নিতে এসেছেন ওঁরা।

কিন্তু ঐ কোটপ্যান্টধারী ছোকরা ডাক্তার বাবু?

এনকোয়ারী অফিস ত একটু আগে বলেই দিয়েছে, উনি অন্য

দাবীদার। তবে কি প্রতিমার আগের জীবনের কোন আত্মীয়, কোন আপনার জন? কে হতে পারে?

কৌতূহলের ডিগ্রী চড়চড় করে বেড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকালাম।

ঐত ডাক্তারবাবু আসছেন।

এবার আমি তাঁর সামনে গেলাম। দু'হাত জোড় করে বললাম, নমস্কার।

ডাক্তারবাবু দাঁড়ালেন। হাত তুলে বললেন, নমস্কার।

অবাকভঙ্গিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি সহজ গলা করে বললাম, খুব আশ্চর্য হয়েছেন। ভাবছেন, আমি আবার কে? আমি কেন প্রতিমার জন্যে মেডিক্যাল কলেজে ছুটে এসেছি?—এইত?

ডাক্তারবাবু আমার দিকে তেমনি করেই তাকিয়ে রইলেন। আর কথা বললেন না কিন্তু দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এবার ডাক্তার বাবুই প্রথমে কথা বললেন, আমি প্রতিমার ছোট ভাই। কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ ওকে প্রতিমা বলে মনে রাখতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। তাই আপনার মুখে প্রতিমার নাম শুনে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম।

একটু ঢোক গিলে ডাক্তারবাবু আবার বললেন, আজ আপনাকে এখানে দেখে আমি বুঝতে পারছি, আপনি নিশ্চয় প্রতিমাকে চিনতেন, নিশ্চয়ই প্রতিমা বেঁচে থাকতে আপনার সঙ্গে তার জানাশোনা হয়েছিল।

বুঝলাম, ডাক্তারবাবুর গলার স্বর উত্তেজনায় কাঁপছে। ডাক্তারবাবু অস্থির দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভদ্রলোককে এর পরেও কষ্ট দেওয়া আমার পক্ষে অন্যায় হবে। আমি এবার টপ্ করে আমার হাত দিয়ে ওঁর একটা হাত চেপে ধরে বললাম, ঠিক ধরেছেন, আপনি প্রতিমার ভাই কিন্তু আমি ওর মায়ের পেটের ভাই না হলেও সে আমাকে নিজের ভাইএর মত বিশ্বাস করে তার জীবনের সমস্ত কথা বলে গেছে। সেই থেকে আমি তাকে আমার বোন বলেই মনে করতাম। তাই কাগজে ছবি দেখে তার মরা দেহটাকে দেখবার জন্যে এখানে এসেছিলাম।

ডাক্তারবাবু এই সময়ে ছোট্ট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তবু একটু পরে ভেজাগলায় বললেন, বলুন, তার সমস্ত কথা আমাকে বলুন আপনি দয়া করে: সে এখানে এল কি করে, এসে এতদিন বাঁচল কি ভাবে, আর মরলই বা কেন?·····বলুন, আপনি যা জানেন, বলুন সব আমাকে। নইলে আমি শান্তি পাব না। প্রতিমাকে যখন নিজের বোন বলে মনে করেছেন, তখন আমাকেও আপনার ভাই বলে বিশ্বাস করুন।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বেচারাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সহানুভূতির স্বরে বললাম, বিশ্বাস আমি করছি ভাই। কিন্তু সে অনেক কথা। আর বড় দুঃখের কথা। এতো কথা-ত এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। তার চেয়ে চলো তোমাদের এখানকার বাড়ীতে যাই। বাড়ী গেলে তোমারও মন সুস্থ হবে, আমিও ধীরেসুস্থে সব ঘটনা তোমাকে জানাতে পারব।

ডাক্তারবাবু চুপ করে কি যেন ভাবলেন। একটু পরে বললেন, এখানে আমাদের বাড়ী নেই। আছে মামাদের বাড়ী। ওখানেই

থাকি আমি। এ সময়ে ও-বাড়ীতে যাব না। তার চেয়ে কাছের একটা পার্কে চলুন। ওখানে দু'জনে বসে সব শুনব।

আমি বললাম, বেশ, তাই চল।

দু'জনে রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম।

তৃতীয়

আজাদের কথা

পার্কের একটা কোণে এসে বসলাম।

তারপর আমি প্রতিমাকে যেমন দেখেছিলাম আর প্রতিমার মুখথেকে যে সমস্ত ঘটনা শুনেছিলাম সেগুলো একটার পর একটা সমস্ত তার কাছে বলে গেলাম।

আমি থামলাম। তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তার সমস্ত মুখখানা তমতম করছে।

বেশ খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বললাম না। অনেকটা পরে সে বলল, আমার তখন চোদ্দ-পনের বছর বয়েস। বাবা আমাকে নিয়ে মামার বাড়ীতে এলেন। তারপরে দিনকতক বাদে আবার দিদিকে খুঁজে আনতে গেলেন। কিন্তু একলাই ফিরে এলেন। মামারা বললেন, ভালই হয়েছে। প্রতিমা এলে আবার নতুন করে ঝামেলা বাধত। আমাদেরও ছেলেমেয়ে আছে ত। হলেই বা সহর। বিয়েটিয়ের সময় তখন সবাই ঘরগেরস্থর খবরাখবর নেয়। মুসলমানদের কেড়ে নেওয়া মেয়ে বাড়ীতে আছে শুনলে, নানা ঝঞ্ঝাট আসতে পরে। বাঁচা গেল যাহোক।

মামারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। রাত্রে ঘরে শুয়ে বাবা কাঁদলেন। আমি বাবার পাশে শুয়েছিলাম। আস্তে আস্তে বললাম, দিদিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না বাবা। তার চেয়ে চল, কালই আমরা দেশে ফিরে যাই।

বাবা বললেন, দেশ বলে আমাদের কিছু নেইরে সুশান্ত। তার চেয়ে এখন এই কোলকাতাই ভাল। তুই এখানে থাক। লেখাপড়া কর। তারপর ভাগ্যে যা থাকে তা' হবে।

মামাদের অবস্থা বেশ ভাল। বড় মামা মোটা মাইনের চাকরী করেন। ছোট মামার মস্ত বড় কাপড়ের দোকান আছে। তাঁরা বাবাকে বললেন, মুখুজ্যেমশাই, আপনি সুশান্তের জন্য চিন্তা করবেন না। ওর পড়াশুনোয় খুব চাড় আছে দেখছি। ও বড় হ'য়ে মানুষ হলে আপনার সব দু'খ দূর হয়ে যাবে। আপনি এখন খাওয়া-দাওয়া করুন আর বিশ্রাম করুন!

বাবা কিন্তু মামাদের কথামত বসে বসে খেতে আর বিশ্রাম করতে চাইলেন না। বাবা এর মধ্যে দেশে গিয়ে যতটা পেরেছিলেন, জমিজমা সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তিনি দু'চারদিন পরে একটা গলির ভেতর ছোট্ট একটা দোকান খুললেন।

আমি স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে লাগলাম।

সন্ধ্যার পর বাড়ী আসতাম বাবাও আসতেন। বাবা খেয়ে-দেয়ে ঘরে শুয়ে পড়তেন। দেখতাম, বাবা দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছেন। আমি বলতাম, বাবা, তুমি অমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? চুপ করে অত ভাব কেন?

বাবা একটু হাসতেন। বলতেন, ও কিছু না। তুই লেখাপড়া কর সুশান্ত।

মাস চার পাঁচ বাদে একদিন বাড়ী ফিরে শুনলাম, বাবার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। ছুটে বাবার কাছে গেলাম। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, বাবা তুমি ভেতরে ভেতরে এমন করে ক্ষয়ে যাচ্ছ, একবার আমাকে জানাও নি বাবা!

ক্ষীণ স্বরে বাবা বললেন, সবই ত ক্ষয়ে গেছে সুশান্ত। দেশ গেছে, জাত গেছে, ধর্ম গেছে, তোর মা গেছে, বোন গেছে।

যখন আর কিছু আমার চেষ্টায় ফিরে পাব না, তখন আমি আর কেন মিছিমিছি হাহুতাশ করতে বেঁচে থাকি বল? বেঁচে থাক তোরা, তোরা বাঁচলে একদিন মানুষ হয়ে হয়ত আবার সব ফিরে পাবি। আর আমার জন্যে দুঃখ করিস নি, নিজের কাজ করে যা সুশান্ত!

তবু আমি হাল ছাড়লাম না। সেদিনই ডাক্তার নিয়ে এলাম। জোর করে ওষুধ আনলাম। ডাক্তার বললেন, ক্ষয় রোগ। নিয়মিত ওষুধপত্তর খেলে আর খাওয়া-দাওয়া করলে সেরে যাবেন। তুমিত এখন সব বোঝ।

কিন্তু সব বুঝেও কিছু করতে পারলাম না।

বাবা ওষুধ খেতেন না, পথ্য খেতেন না। আমি কলেজে চলে গেলে সব ফেলে দিতেন।

শেষ সময়ে বাবার কাছে বসেছিলাম। মামারা বললেন, মুখুজ্যেমশায়ের কানে হরিনাম শোনা সুশান্ত। এই সময়ে ছেলের কাজ কর।

কাঁদতে কাঁদতে বাবার মুখের দিকে তাকালাম। বাবা হাত তুলে আস্তে আস্তে বললেন, থাক, হরি আমায় পারলে কি করবেন না করবেন, তার জন্যে দুশ্চিন্তা করিস নি। যাবার আগে তোকে একটা কথা বলে যাই সুশান্ত, পারিস ত বাবার কথাটা মনে রাখিস। ধর্মকে রক্ষে করবার দোহাই দিয়ে কখনো মানুষের মনুষ্যত্বকে ঘেন্না করবি না, কখনো ধর্মের নামে মানুষকে তাচ্ছিল্য বা অপমান করবি না। নিজের জাতের মানুষকে সব সময়ে নিজের জন বলে মনে করবি। কারো চোখ রাঙানীর ভয়ে পেছিয়ে যাবি না। বুঝেছিস?

আমি ভিজে গলায় বলি, বুঝেছি বাবা। সব বুঝেছি। আর বলতে হবে না।

বাবা চোখ বুজলেন।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। তবু যেন দেখলাম, মা'র মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসছে। দিদির মুখখানা ডগডগ করে ফুটে উঠছে।

আমি অস্থির হয়ে আবার চোখ খুলে তাকালাম। কিন্তু বাবা আর চোখ খুললেন না। শেষবারের মত চোখ বুজলেন তিনি।

চুপ করল সুশান্ত।

তার চাপা গলার স্বর আশপাশের জায়গাটাকে যেন ভারি করে দিল।

আমিও আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না।

সুশান্তই আবার কথা বলল, আমি গেল বছরে এম, বি, বি, এস, পাশ করেছি। মেডিকেল কলেজে কাজও পেয়েছি। বাবাকে, মাকে, দিদিকে ছেড়ে জীবনের স্রোতটা নতুন ভাবে বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ক'দিনের ভেতর এমন একটা সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, যার জন্যে কেবলই মনে হচ্ছে, আমি এরপর বোধহয় বাবা মরবার সময়ে যে অনুরোধ করে গিছিলেন তা' নিজের জীবনে মাথা উঁচু করে রক্ষে করতে পারব না। বাবার কথামত মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্মান দেবার সংকল্প করেছি বলে, মামাদের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, চেনাজানাদের সঙ্গে এখানে এসে যে যোগাযোগের বন্ধন গড়ে উঠেছিল, তাকে এরপর ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এত বড় সহরে বাস করেও, এই বিজ্ঞানের যুগের মানুষ হয়েও, নিজের রোজগারের পয়সায় খাওয়া পরা থাকা চালিয়েও আমি সমাজচ্যুত হয়ে যাব, আমি আত্মীয়পরিজন

স্বজাতির দৃষ্টিতে একঘরে হয়ে বাস করব। এক কথায় বলা যায়, আমার জীবনের নতুন স্রোত জাতের আর ধর্মের বালিয়াড়ীতে ধাক্কা খেয়ে আবার শুখিয়ে যাবে।

থামল সুশান্ত।

সময় কেটে যায়। তখনো সে কোন কথা বলে না। আমি উৎসুক ভাবে বলি, তুমি বল সুশান্ত, সবে ৩ রাত সাতটা সাড়ে সাতটা। আরো ত্ু'ঘন্টা দেরী করে গেলেও মা ভাববেন না।

সুশান্ত একটু হাসল। বলল, কিন্তু বেশী রাত করে গেলে আমার মামারা এখন খুব ভাবনায় পড়ে যাবেন। ভাববেন, আমি সন্ধ্যের পর আবার বুঝি মমতার মেসে গেছি। মমতার মমতায় ক্রমশ জড়িয়ে মামাদের মমতার বন্ধনের সঙ্গে ধর্মের বন্ধনকেও টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবার চক্রান্ত করেছি।

আবার একটু হাসল সুশান্ত। এবার বলল, তা ভাবুন তাঁরা একদিন তাঁরা। তবু আমার আসল কথাটা যখন পেড়েছি আপনার কাছে, তখন সবই আপনাকে খুলে বলব আজ।

আমি আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুশান্ত বলতে লাগল, মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তেই আমার আলাপ হয়েছে মমতার সঙ্গে। মমতাকে এখন আমি বিয়ে করতে চাই। তবে মামারা এ বিয়ে একেবারে পছন্দ করেন না; কারণ মমতা হিন্দুর মেয়ে হলেও তাঁদের বিচারে তার জাত নেই, ধর্ম নেই। তাঁদের ভাগ্নে এমন মেয়েকে ঘরে এনে শেষটাতে তাঁদের ঘরকে কলঙ্কিত করবে। পাড়ায় ঘরে, পাঁচজনের কাছে, জ্ঞাতগুষ্টির সামনে তাঁদের মুখ ডোবাবে। তাই তাঁরা শুনিয়ে দিয়েছেন, হয় ঐ জাতিচ্যুতা মেয়েটাকে ছাড়তে হবে, না হয় মামাদের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কটাকে ছাড়তে হবে।

আমি শুনতে শুনতে আচমকা বলে ফেলি, এই মমতা কে? তার ঘটনাটা কি সুশান্ত?

সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তাহলে মমতার সব কথা আপনাকে খুলে বলি। শুনুন এবার। মমতার মুখ থেকে যা জেনেছি, সব আপনাকে জানাচ্ছি।

বলে যায় সুশান্ত,...

হাজার বছর ধরে যে মাটিতে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বাস করেছে, কংগ্রেস আর মুস্‌লিম লিগের দুটো কলমের খোঁচায় সেই মাটি রাতারাতি চড়চড় করে দু'ফাঁক হয়ে গেল। জন্ম নিল পাকিস্তান আর ভারতরাষ্ট্র।

পাকিস্তান! মুসলিম লিগের ভাষায়, মুসলমানদের পবিত্র বাসস্থান, হিন্দুর আধিপত্য আর শোষণবিহীন মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বদেশ!

ভারত! কংগ্রেসের ভাষায়, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বাসভূমি। কারো একার দেশ নয়, কারো একার বাসস্থান নয়। সবাই এখানে সমান অধিকার নিয়ে সমান মর্যাদার সঙ্গে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। হিন্দুরা এখানে একলা প্রভু নয়। মুসলমান, খ্রীষ্টান অধিবাসীর সমান অংশীদার মাত্র। এখানে, এই টুকরো ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক গোঁড়া হিন্দুর কোন ক্ষমতা নেই একজন মুসলমানের উপর অন্যায়ভাবে চোখ রাঙাবার।

আর ওখানে, ওই পাকিস্তানে?

ওখানে দেশ ভাগ হবার পরেও যে হিন্দুরা থেকে গেল, তারা পাকিস্তানের অধিবাসী হয়েও দিনরাত ভয়ে ভয়ে রইল, না জানি কখন কোন ছলে অত্যাচারের খাঁড়াটা নেমে এসে তাদের ধনপ্রাণকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তারা বেঁচেও মরে রইল।

তবু তারা সেখানেই রইল। আর যাবে কোথায়? ভারতরাষ্ট্রে? কি সম্বল করে তারা যাবে এদেশ থেকে?

বংশপরম্পরায় যুগ যুগ ধরে যে মাটির বুকে হাসিকান্নার দিনগুলি কাটিয়েছে, যে মাটির উপর হাজার হাজার বছর ধরে ঘরবাড়ী জমিজমা বিষয়সম্পদ গড়ে তুলেছে, সেই মাটির মায়া ছেড়ে দেওয়া কি এতই সোজা।

এরমধ্যে ওদিক থেকে,...ভারত থেকে চীৎকারের শব্দ ভেসে আসে,...আর দলে দলে এসো না, এসো না তোমরা এই মানুষে মানুষে ঠাসা আধকাটা ভারতবর্ষে। এখানে আর "রিফিউজির" ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। তোমাদের সংখ্যার চাপে এদেশের মানুষ যে চাপা পড়ে যাচ্ছে। অতএব ঐ দেশেই থাক, যে মুসলমানদের সঙ্গে এতদিন জান মান ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে ঝগড়া-বিবাদ আর "কাজিয়ে" করেছ, সেই মুসলমানদের সঙ্গে বনিয়ে, তাদেরই দয়া আর সদিচ্ছার উপর আত্মসমর্পন করে ওই পাকিস্তানেই বাস কর। আর তা না পার, ওখানেই মর।...

তাই হল। ওদের হুঁশিয়ারী এখানকার, এই পাকিস্তানের বাকী হিন্দুরা মেনে নিল।

পাকিস্তান হবার মুখে যারা জোর করে হুদ্দাড় করে চলে এসেছিল, তারা কেউ কেউ সম্পত্তি বেচে-আনা পয়সার জোরে, কেউ কেউ মুরুব্বির জোরে এখানে গুছিয়ে ঘরসংসার নতুন করে পেতে বসল, আর কেউ কেউ সরকারী টাকায় দেশ-ভাগের ঝড়টার তাল সামলিয়ে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করল, আবার অনেকে ঝড়ের খুটোর মত একবার এখানে, একবার সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগল। সরকারী ডোলে মাঠেঘাটে বনেজঙ্গলে হোগলার চালে আর দড়মার দেওয়ালে দিন কাটাতে লাগল।

এই "অনেকেই" হল সর্বহারা, তাই সবাইএর কৃপা ভিখারী "রিফিউজি"—এই যুগের নতুন একজাতের মানুষের নামের ছাপ !

পাকিস্তানের বাকী হিন্দুদের কানে এই খবরটাও পৌঁছেছিল। ওরা ওদেশের আর এদেশের সব অবস্থাই খতিয়ে বুঝে নিল। তাই উনিশ্‌শ সাতচল্লিশের পরেও এক কোটিরও বেশী হিন্দু ঐ মুসলমানদের পবিত্র স্থান পাকিস্তানেই মরিয়া হয়ে বসবাস করতে লাগল।

আর তাইত মমতার গরীব বাবা ছেলেপিলে নিয়ে মাটির বাড়ী আর আটদশবিঘে ধানের জমি ভরসা করে ওখানে,—ঢাকা জেলার একটা অখ্যাত গ্রামে মাটি কামড়ে পড়ে রইল। আগে গ্রামে হিন্দু অনেক ঘর ছিল। পাকিস্তান হবার আগে আর ঠিক পরে বেশীর ভাগই দেশ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তারা দশবার ঘর গেল না। অর্থাৎ যেতে পারল না। গ্রামে মুসলমানরাও ছিল। পাকিস্তান হবার আগে হিন্দু পাড়ার বাইরে ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হবার পরে তারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু পাড়ার ভেতরে বাস করতে লাগল। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া বাড়ী দখল করে নিল। আশপাশের গ্রামের মুসলমানে হিন্দুদের গ্রামের বার আর ভেতর পূর্ণ হয়ে গেল। বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে নতুন প্রতিবাসী এসে যোগ দিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অ-বাঙালী মুসলমানদের দল দলে দলে তাদের নতুন পাওয়া সাম্রাজ্যের রূপ দেখতে আর রস ভোগ করতে পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে আস্তানা গাড়লেন। সরকারী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আর ঐ সঙ্গে স্বধর্মী বাঙালী মুসলমান ভাই-ব্রাদারদের আদর আপ্যায়নে মহীয়ান হয়ে বাংলার নরম মাটিতে তারা শক্ত হয়ে বসবাস আরম্ভ করলেন।

বাঙালী হিন্দুদের দুঃখের দিন তবু কাটতে লাগল।

স্বজাতি আর ভিন্নজাতি পাকিস্তানী মুসলমানদের সদাসর্বদা সতর্কভাবে তোয়াজ করতে করতে খোঁয়াড়ে বাঁধা পশুর মত আরো তিনটে বছর কোনরকমে কাটিয়ে দিল।

এল উনিশ'শ পঞ্চাশ সাল।

সেই সঙ্গে নেমে এল পাকিস্তানের খণ্ডিত সংঘ্যালঘু বাঙালী হিন্দুর বন্দী জীবনে নতুন খাঁড়ার আঘাত!

পশ্চিমা মুসলমান বাঙালী মুসলমান ভাইদের কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল, আর কেন এই পবিত্র বাসভূমিতে বিধর্মি কাফেররা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবে? তবে এত কষ্ট করে পাকিস্তান পয়দা করে লাভটা কি? আবার যদি ঐ হিন্দুগুলো কোনদিন কোন ফিকিরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যা ফিকিরবাজ জাত ঐ হিন্দুরা। অতএব, হে পাকিস্তানীগন, বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে আর একবার হাতিয়ার নাও। পাকিস্তান নিস্কণ্টক কর।

তোবা তোবা করে উঠল পূবের আর পশ্চিমের ভাই ব্রাদারের দল।

হঠাৎ সদলবলে লাঠিসড়কি, বন্দুককিরিচ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাফের নিধনে, বাঙালী হিন্দুর ঝাড়ে বংশে মূলোৎপাটনে।

সারা পূর্ববাংলা জুড়ে সাম্প্রদায়িক নিধন যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠল।

একদিন সন্ধ্যের পর থেকেই মমতাদের গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

হিন্দুরা প্রাণের মায়ায় বাড়ীঘরের মায়া ত্যাগ করে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল।

তবু তারা প্রাণে বাঁচল না।

পাঠান-মুসলমানরা খোলা কিরিচ নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল।

উত্তেজনার আনন্দে চীৎকার করতে করতে শিকারের পশুর মত তাদের জবাই করতে লাগল।

প্রায় শেষ হয়ে গেল কাফেরের দল।

মমতার বাবা আর মা আটবছরের বালিকা মমতার হাত ধরে ছুটে পালাচ্ছিল। পেছন থেকে মার মার শব্দে ওরা ছুটে আসতে লাগল। ওরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। যে যেদিকে পারল ছটকে পড়ল। ছটকে পড়ল আর এক দিকে আট বছরের মেয়ে মমতা। আগুনের তাণ্ডব দেখে আর হাজার কণ্ঠের আকাশ ফাটান হল্লা শুনে ছোট্ট মেয়েটা খরগোশের ছানার মত সামনের দিকে ছুটতে লাগল। কোথায় গেল তার বাবা, কোথায় গেল তার মা, সে খেয়াল তার রইল না।

খেয়াল যখন হল, তখন সে বুঝল, সে একটা বাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

বাড়ীটা গ্রামের পূবধারে, ওদিকটা শুধু মুসলমানদের পাড়া।

আট বছরের মেয়ে। তবু সে বুঝতে পারল, বাঘের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে সে দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে বাঘের আস্তানার মধ্যে এসে ঢুকেছে।

আর অন্যদিকে ছুটে পালাবার তার দম নেই। বুদ্ধিও ফুরিয়ে গেছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সামনেই একটা বেশ বড়গোছের খড়ের ছাওয়া ঘর। ঘরের দাওয়ায় একজন বুড়োগোছের মানুষ লণ্ঠনের আলোর সামনে কিসব কাগজপত্তর মেলে পড়ছিল আর লিখছিল। তার দাড়ির সাদা চুলগুলো লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছিল।

মমতার হাঁপানির শব্দেই হোক কিংবা উঠোনের উপর তার দেহের ছায়া পড়ার জন্যেই হোক বুড়ো উঠোনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কে ওখানে? কে ওথানে দাঁড়িয়ে?

সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা একহাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তালকাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নেমে মমতার সামনে এসে লণ্ঠনটা তার মুখের কাছে তুলে ধরল।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মমতা, তখনো কোন কথা বলতে পারল না। শুধু আরো জোরে কাঁপতে লাগল।

বুড়ো ঘরের দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল, ওরে ও ফিরোজা বিবি, একবার এখানে আয় দিখি। এই ছাখ, কাদের এ্যাট্টুকু ছোট মেয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আয়, শিগ্‌গীর আয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ফিরোজা বিবি। বয়স পঞ্চাশের উপর হবে। বুড়োরই বিবি। ফিরোজা সেখানে এসে বলল, ওমা এযে মনে হচ্ছে হিঁদুদের মেয়েগো। পাঠান মিনসেরা ওধারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ওদের মারছে, তাই বুঝি মেয়েটা ও পাশ থেকে কোনরকমে পালিয়ে এসেছে মিঞা। দেখ, দেখ, কেমনতর ভয়ে কাঁপছে দেখ। আহা, বাছারে!

মমতার নিস্পন্দ চোখদুটোও এবার একটু কেঁপে ওঠে, তার বোবা মুখে একটা আর্তস্বর ফোটে, মা···আ···আ···

সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে সে উঠোনের মাটির উপর। বুড়ো তক্ষুনি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, মেয়েটা হুঁশ হারিয়ে ফেলেছে। ওকে হাতনের ওপর তোল। ওর মুখেচোখে জল দাও বিবি। ইয়ে আল্লা! কাদের মেয়েগো! বাপমারে বোধহয় ওরা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। মেয়েটা বুঝি কোন ফাঁকে চোখ এড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

ভোরের আলো জাগে। মমতাও জেগে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

চোখ চেয়ে দেখে, বুড়ো আর তার বিবি তার পাশে বসে আছে। আর ওদের কাছে বসে আছে আর একজন মানুষ। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের জোয়ান পুরুষ।

মমতাকে তাহলে এখনো খুন করেনি। কিন্তু এরাও ত মুসলমান। তবে?

সে আর কিছু ভাববার আগেই বুড়ো হাসিমুখে বলল, ভয় নেই রে বেটী, কিছু ভয় নেই,। আমরা মুসলমান হলেও মানুষত বটে। কাল কিছু খাওয়া জোটেনি। নে, ওঠ, খানাপিনা কর। তারপর আজাদের সঙ্গে মতলব পরামর্শ করে দেখি, তোর জন্যে কতদূর কি করতে পারি।

বুড়োর বিবি জোয়ান মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, আজাদরে, গাইটা দুয়ে খানিকটা দুধ আনতো বাপজান। আমি চারটে চিঁড়ে ঝেড়ে দিচ্ছি। দুধ জ্বাল দিয়ে দেব এখুনি।

বিবি আবার বুড়োর দিকে ঘুরে বলল, তুমি এরমধ্যে ঘরের পেছন থেকে একটা কলাপাতা আর একছড়া কলা কেটে আন মিঞা। মেয়েটাকে পেট ভরে দুটো খেতে দিতে হবেত গো। আহা, মেয়ের আমার মুখখানা শুখিয়ে গেছে!
খেতে হল মমতাকে! ফিরোজা বিবি স্নেহমাখা গলায় বলল, এতে তোর জাত যাবে না মা। আমাদের ঢেঁকিতে কোটা চিঁড়ে আর গাইএর দুধতো হিঁদুরা চিরটা কালই কিনে খায়। এছাড়া আর কি করবি বল? এখানে যে ক'টা দিন থাকবি, এই সব খেয়েই থাকতে হবে।

সবই খেতে হল মমতাকে।

এবার বুড়ো বলল, বেটীকে ঘরের ভিতর নিয়ে যা। কি জানি কে দেখে ফেলে, যদি কিছু বলে? আমি একবার এ বাড়ী

ও বাড়ী ঘুরে আসি। কেউ কিছু জানে কিনা, কেউ কিছু বলে কিনা। পারি ত হিঁদুপাড়ার ওধারেও একটা চক্কর দিয়ে আসব, জেনে আসব, এখনো ওধারে কেউ আছে কিনা।

বেরিয়ে গেল মিঞা। বিবি মমতাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গেল।

খানিকটা পরে জোয়ান মানুষটা ঘরে এসে বলল, আম্মা, বোনকে দেখি আর একবার। ওর একটা নতুন জামা বানিয়ে আনব। আর শোন, এরমধ্যে যদি কেউ এসে দেখে, তাহলে বলবে, আমার ফুপুর মেয়ে, কাল ফরিদপুর থেকে বেড়াতে এসেছে। দেশের গণ্ডগোলটা একটু মিটলে, তবে আবার ফিরে যাবে। দেখো, বোনকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখো। নইলে কার মনে কি আছে বলাতো যায় না এখন।

মমতার কাছে গিয়ে হাসিমুখে বলল, ভয় নেই বোনডি, আমি যে তোর দাদারে।

আবার হাসতে হাসতে চলে গেল আজাদ।

আজাদের মা বলল, ব্যাটার আমার হাটে সেলাইএর দোকান আছে। তোর জন্যে পোষাক করে আনবে। তাহলে হঠাৎ কেউ দেখলেও সন্দেহ করবে না। তুই বরং একটু ঘুমো বেটী। ঘর সংসারের কাজগুলো সেরে নি এরমধ্যে।

আজাদের মাও চলে গেল। তবু মমতা ঘুমোতে পারছিল না। ছোট্ট মনটার এককোনে বাপমার জন্যে দুশ্চিন্তা, আর এক কোনে হঠাৎ জাগা একটা নতুন চিন্তা।

তাহলে এরা মুসলমান হলেও তাকে মারবে না? তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে? কিন্তু কেন?

তার ছোট বুদ্ধি এ 'কেন'র উত্তর খুঁজে পায় না। সে বুঝে

উঠতে পারে না, বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকেও, বাঘের মুখে না গিয়ে মানুষের মুখের দেখা পেল কেমন করে !

অনেকটা বেলা করে বুড়ো মিঞা ফিরে এল। বিবি তখন খানা পাক করে ঘরের মধ্যে বসেছিল। আজাদ দুপুরে ফিরে এসেছিল। তার হাটের দোকান থেকে মমতার পোষাক তৈরী করে এনেছিল।

বুড়ো বলল, গণ্ডগোল এখনো কমেনিরে বাপজান। কিন্তু ওখানে আর বড় একটা কেউ নেই। যারা বাঁচতে পেরেছে, সবাই এদিকে ওদিকে ছিটকে ছটকে পালিয়ে গেছে। হয়ত সহরের দিকে গেছে। যদি ওখানে হিন্দু পাড়ায় গিয়ে বাঁচতে পারে।

একটু থেমে আবার বলল, তবে শুনে এলাম, সহর থেকে বন্দুক নিয়ে সেপাই আসছে। গ্রামের দারোগাসাহেব গণ্ডগোল থামাবার মতলবে সেপাই পাঠাবার জন্যে খবর পাঠিয়েছেন।

আজাদ শুনতে শুনতে চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তাহলে বোনডির কি হবে বাপজান ?

বুড়ো মাথা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিল, যে কটা দিন রাস্তা-নিরাপদ না হয়, বেটীকে এ বাড়ীতে থাকতেই হবে। হলেই বা আমরা মুসলমান। বেটীর জাত যাবে না। ভাত না হয় নাই খাবে। মুড়ি-চিড়ে খই খাবে, দই দুধ কলা খাবে। প্রাণটাকে বাঁচাতে হবেত। তারপরে এদিকে একটু শান্ত হলে, রাস্তাঘাটে সেপাই দাঁড়ালে, তুই আর আমি বেটীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় যাব। খোঁজ করে দেখব, ওখানে ওর বাপমা থাকে কিনা।

ফিরোজা বিবি এবার বলল, কিন্তু মিঞা, ধর যদি ওখানেও ওর বাপমায়ের খোঁজ না পাও ?

মিঞা ভাবনা-ভরা স্বরে বলল, সবই খোদার মেহেরবাণী। যাহোক কিছু একটা চেষ্টা করতে হবে ত। বুঝলে বিবি, হিঁদুর

মেয়েকে হিঁদুদের ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বুঝলে বাপজান, খোদাতালা বলেন, যে প্রাণের ভয়ে তোমার আশ্রয় নেবে, তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে তুমি রক্ষে করবে।

আজাদ বাপের কথা শুনে মুখে কিছু বলল না। শুধু হাঁটু গেড়ে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। দু'হাঁটুর উপর নিজের দুটো হাত রেখে বারবার মাটিতে মাথা ছোঁয়াল।

বুড়ো ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল। বিবি হাসল। মমতার দিকে চেয়ে বলল, ভাইজান তার দুঃখী বোনের জন্যে খোদার দোয়া চাইছে। তুই আর ভাবনা করিস নে বেটী।

বার-তের দিন পরে বুড়ো মিঞা আর আজাদের সঙ্গে মমতা এল ঢাকা সহরে।

সহরের গণ্ডগোলও তখন কমেছে। কিন্তু বন্দুকধারী মিলিটারী পুলিশ তখনও রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দিচ্ছে।

ওরা ঢাকার রেলষ্টেশনে আর জাহাজঘাটায় একটা গোটা দিন বারবার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। কত হিন্দু চলে যাচ্ছে ভারতে, আবার কত হিন্দু কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে গাড়ীতে বা ষ্টিমারে উঠে বসছে। ভাবছে, এধারে প্রাণের ভয়, বুঝি অন্য কোথাও গেলে ভরসা পাবে, আশ্রয় পাবে। ভয়কাতর ভেড়ার পালের মত এধার ওধার ছোটাছুটি করছে, ধাক্কাধাক্কি করছে, কান্নাকাটি করছে।

আর আশপাশের পশ্চিমা মুসলমানরা কখনো মজা দেখছে, কেউ কেউ হো হো করে হাসছে। একজন পশ্চিমা মুসলমান রাস্তার ধারের একটা হোটেলে বসে চা খেতে খেতে তার পাশের একজন বন্ধুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেশ চড়া গলায় বলছে, দিলমে রহুত

দরদ দোস্ত। ই কেইসে হো সক্‌তা হ্যায়। পাকিস্তান পয়দা হুয়া, লেকিন হিন্দুকে বালবাচ্চা জান লেকর ভাগতা হিঁয়াসে। তব হুম্ কিসকো সাথ হিঁয়াপর চাকু লেকর খেল করেঙ্গে ?

তার ঠাট্টা শুনে হোটেলের সমস্ত খদ্দের প্রচণ্ডরবে অট্টহাস্য করে উঠল।

রাস্তা চলতি মানুষগুলো চমকে উঠল। পথ চলতে চলতে চমকে উঠল বুড়ো মিঞা, আজাদ আর মমতা।

বুড়ো মিঞা জীবনে অনেকবার সহরে এসেছে। সে হিন্দি-ভাষা বোঝে। সে ওদের নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

ভারি স্বরে বলল, বেটা আজাদ, আমার দিল বলছে, ওর বাপমা আর নেই। গাঁয়ে নেই, সহরে নেই, দুনিয়ার কোথাও নেই। এখন কি করা যায় বলতো বাপজান ?

বুড়ো একটু যেন ভাবল। তারপর আবার বলল, সহরের অবস্থা এখনো ভাল দেখছি না। মিলিটারির জন্যে এরা হাত-গুটিয়ে বসে আছে, নইলে আরো খুনখারপি হত রে।

আজাদ একসময়ে বলল, আচ্ছা, বোনডিকে কোন হিঁদুর বাড়ীতে রেখে গেলে হয়না ?

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বলল, হয়না বেটা। রাখতে গেলেও ওরা রাখবে না। এই গণ্ডগোলে সহরের হিন্দুরা নিজেরা বাঁচবে, না মেয়েটাকে বাঁচাবে ? কে পরের মেয়েকে নিয়ে বোঝা বাড়াবে ? হয়ত বেটী আবার নতুন বিপদে পড়বে।

এরপর আর কুলকিনারা খুঁজে পায় না আজাদ। তবে তার বাপজানই আবার তাকে কিনারাটা দেখিয়ে দেয়, তুই একটা কাজ কর বেটা। বেটীর গায়ে মুসলমান মেয়েদের পোষাক, তুইও মুসলমানের ছেলে। ওকে নিয়ে জাহাজে চড়ে ওধারে, পাকিস্তানের

কিনারে চলে যা। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি, তোর ফুপুর বেটী, তোর বোনডি। বেড়াতে এসেছিল, আবার বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।

আজাদ আগ্রহের স্বরে বলল, আচ্ছা বাপজান, তারপর?

বুড়ো মিঞা বলল, তারপর আর শক্ত কিরে ব্যাটা। তার পরে এধারে পাকিস্তান আর ওধারে হিন্দুস্তান। তুই হিঁদুর মেয়েকে ওধারে হিন্দুস্তানের মাটিতে ছেড়ে দিয়ে আসবি।

আজাদ যেন চেঁচিয়ে ওঠে, কি বলিস বাপজান! এতটুকু মেয়েকে পথে ছেড়ে দিয়ে আসব?

বুড়ো ধীর গলায় জবাব দিল, হ্যাঁ, দিয়ে আসবি। পাকিস্তানে ওর কেউ নেই, তবু হিন্দুস্থানে গেলে হিঁদুদের দেখা পাবে। হিঁদুদের দেশে হিঁদুর মেয়ে হিঁদুর আশ্রয় পাবে। ওর জাত বাঁচবে, ওর ইজ্জত বাঁচবে। আর খোদা, আর বেটীর আজাদ ভাইএর কসম বাঁচবে। হ্যাঁরে ব্যাটা, মনে রাখিস, খোদার কাছে কসম করেছিস, বোনকে বাঁচিয়ে বোনের ইজ্জত বাঁচাবি। সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা হবি।

হাসিতে ভরে ওঠে আজাদের মুখখানা।

জাহাজঘাটে এসে আজাদ আর মমতা জাহাজে ওঠে।

মমতার মনে হয়, সে যেন জেগে নেই। এ' কদিন সে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেবল স্বপ্ন দেখছে; তাইত এখন সে আবার দেখছে, সে এক প্রকাণ্ড জাহাজে চড়েছে। সে জাহাজের রেলিং ধরে তীরের দিকে, জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে আছে। আর তীরে জাহাজের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ো মুসলমান। সাদা তার মাথার চুল, সাদা ধবধবে তার মুখের দাঁড়ি। বুড়ো তার দু'হাত মাথায় তুলে নাড়ছে আর খলখল করে হাসছে।

হাসতে পারে না মমতা। জেগে ছিল যখন তখন কত হেসেছে,

নিজের বাবামা'র কাছে, তার খেলার সঙ্গীসাথীদের কাছে, সে কত না হেসেছে। কিন্তু স্বপ্নের ভেতরে কি তাকে শুধু কেঁদেই কাটাতে হবে? নইলে এখানে, এই জাহাজে দাঁড়িয়ে তীরের বুড়ো মিঞার দিকে তাকিয়ে এমন ঝরঝর করে চোখের জল ফেলছে কেন সে?

বাবামার কথা মনে করে সে একবারও কাঁদবার সময় পায়নি। তবে কি ঐ বুড়ো মিঞাকে দেখতে দেখতে আজ এ কদিন পরে তার হারান বাপমার কথা মনে পড়ছে? তার যেন মনে হচ্ছে, ঐ দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানের বেশ ধরে তার বাবা নিজে। যেন তার বাবাই তাকে হাত তুলে বলছে, ভয় নেই বেটী, তোর কোন ভয় নেই, আজাদ ভাইজান সঙ্গে রইল। কিছু ভাবনা করিসনি আর।

আর এমন করে স্বপ্ন দেখতে পারে না আট্ বছরের মেয়েটা। সে বাস্তবের মাটিতে ফিরে যেতে চায়। তাই সে তু'হাত দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরে। যদি তার এই স্বপ্নের দৃশ্যগুলো চাপা পড়ে যায়।

জাহাজ দূরে চলে যায়।

মমতার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

সে দেখল অন্য আর একদল লোকের মাঝখানে সে রয়েছে। তারা ধুতি আর সার্ট পাঞ্জাবী পরে অছে। ছোট্ট হলেও সে বুঝতে পারল, এরা মুসলমান নয়, এরা সবাই হিন্দু।

সে হিন্দুদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, সে হিন্দুস্তানে এসেছে।

ওরা মমতাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করল। পাকিস্তানের কোথায় তাদের গ্রাম আর বাড়ী, তাও জানতে চাইল। তার বাবামার কথা জিজ্ঞাসা করল। সে কি করে পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে ট্রেনে করে এপারে এল, তাও জানতে চাইল।

মমতা এক এক করে সব কথাই বলল। শেষ ঘটনাগুলো তার মনে ছিল। মনে ছিল, আজাদ ভাই জাহাজ থেকে নেমে তাকে সঙ্গে নিয়ে আর এক জায়গা থেকে রেল গাড়ীতে উঠেছিল। কাল রাতে তারা রেল থেকে এখানে নেমেছে। গ্রামের ছোট্ট মেয়ে সে। এর আগে গ্রাম ছেড়ে সে কখনো বাইরে বেরোয়নি। জাহাজ, ট্রেন, নতুনদেশ, এসব দেখতে দেখতে সে হক্‌চকিয়ে গিছিল, বোবা হয়ে গিছিল যেন। সে কোন কথা বলতে পারেনি। আজাদ ভাই তার হাত ধরে রেলষ্টেশনের একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়েছিল, কোত্থেকে কি সব খাবার এনে খাইয়েছিল। সে এক সময়ে বলেছিল, বড় ঘুম পেয়েছে। আজাদ ভাই তাকে ঐ বেঞ্চির উপর শুতে বলেছিল। সে শুয়ে পড়েছিল।

তারপর ?

তারপর খানিকটা পরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাই স্বপ্নের ঘটনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে দেখে, কোথায় গেল আজাদ ভাই, কোথায় গেল সেই বুড়ো মিঞা, কোথায় গেল তাদের দেশ আর গ্রাম, কোথায় কোথায় তাদের সেই গ্রামের মাটির বাড়ী, তার বাবা, তার মা,……জেগে উঠে সে অজানা অচেনা দেশের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। তাইত তার কান্না শুনে এরা এসে তার আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। তার কাছ থেকে একটা একটা করে সব ঘটনাটা শুনে নেয়।

ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কেউ বলল, ঐরকম কত আসছে, আরো কত আসবে। চোখের সামনে ছেলে মেয়েকে মরতে দেখে বাপমা পালিয়ে আসছে, বাবা মাকে জবাই-হতে দেখেও প্রাণের মায়ায় ছেলেমেয়ে পালিয়ে আসছে। প্রাণের মায়া বড় মায়া ভাই।

আর একজন কে যেন বলল, যাক, এখন মেয়েটাকে ঐ······ সঙ্ঘের সাধুদের কাছে দিয়ে এস। ওরা এইরকম আরো অনেক অনাথ ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে। ওদের আত্মীয়স্বজনের খোঁজ-খবর করেছে। আপনার লোকজনের সন্ধান না পেলে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেবে। ওদের আশ্রমে রেখে দেবে। এদেশে এসে এ ছাড়া আর ওদের অন্য গতি কি হবে বল ?

মমতা কোলকাতায় এল। সঙ্ঘের উদ্ধারাশ্রমে আশ্রয় পেল।

তার বয়েসী, তার চেয়ে ছোটবড় আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে ওখানে মানুষ হতে লাগল। ওদের আশ্রয় দেবার জন্যে, ওদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এই সঙ্ঘ দেশের অনেক উদার মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পায়। মমতাও লেখাপড়া করবার সুযোগ পেল। আট ন'বছরের মমতা সতের বছর বয়সে স্কুলের পরীক্ষা পাশ করল। তারপর আরও দু'বছর নার্শিং পড়ল। সিনিয়র নার্শিং-এ পাশ করে কলকাতারই এক মেডিকেল কলেজে নার্শের চাকরী পেল।

সেই বছরেই আমি ঐ কলেজ থেকে ডাক্তারী পড়ার শেষ পরীক্ষা দিলাম।

হাসপাতালের রুগীদের দেখবার ডিউটি পড়ত আমার। ওই ওয়ার্ডেই মমতারও কোন কোন দিন রোগীদের নার্শ করবার ডিউটি পড়ত। ওখানেই ওর সঙ্গে আমার দেখা আর পরিচয়।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরে মমতা আশ্রম থেকে চলে এসেছিল। শ্যামবাজারের রাস্তার ধারে একটা দোতলা বাড়ীর ওপর তলায় ওরা পাঁচছ'জন চাকুরে মেয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে এতদিন আছে।

থামল সুশান্ত।

একটু পরে আবার উদাস গলায় বলল, কিন্তু দাদা, ওর এদেশে চলে আসবার যে আশ্চর্য ঘটনাটা আমি ওর মুখ থেকে একদিন শুনেছিলাম, সবই আপনাকে জানালাম। তবে একটা কথা কি জানেন? মমতা ছাড়া আর কেউ বললে আমি ঐ বুড়ো মিঞাদের ঐ সব গালগল্প বিশ্বাসই করতুম না মোটে।

আমি হেসে ফেললাম। শান্তভাবেই বললাম, গালগল্প বই থেকে পড়ে বা লোকের মুখথেকে শুনতেই ভাল লাগে। নিজের জীবনের মরণবাঁচনের ঘটনা নিয়ে মমতাদের মত মেয়ে গালগল্প শুনিয়ে লোককে ভোলায় না ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে সুশান্ত অস্থির স্বরে বলল, কিন্তু প্রতিমার মত মেয়েদের জীবনের কথাগুলো তাহলে যে মিথ্যে হয়ে যায়। নোয়াখালীর নুরুল্লা মিঞা আর শিয়ালদা হোটেলের আবদুল খাঁর ইতিহাসগুলোও তাহলে ভুলে যেতে হয়। হাজার হাজার হিন্দুর প্রতিমা ধর্মান্ধ মুসলমানদের ফতিমা হয়ে কেমন করে বেঁচে থেকেও মরার যন্ত্রণা ভোগ করছে, এ সব মর্মান্তিক পরিণতিও তাহলে অবিশ্বাস করতে হয়। আমার মরা বোন বলে যাকে দেখবার জন্যে একঘণ্টা আগে ঐ কলেজটায় ছুটে গিছিলাম, তাকে জলজ্যান্ত একটা মিথ্যে বলে নিজের অশান্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে হয়। বলুন, তাহলে এসব জিজ্ঞাসার আপনি কি উত্তর দেবেন?

মনে হয় সুশান্ত যেন উত্তেজনায় কাঁপছে, বাইরে শান্ত হবার চেষ্টা করেও মনে মনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

আমি তবুও অচঞ্চলভাবে বলি, হ্যাঁ ভাই, প্রতিমা এখন একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে, আর ঐ মিথ্যের পেছনে নিজের বোন বলে দাবী করে ব্যর্থ-চেষ্টা করতে কাল ঐ হাসপাতালে যেও না। কারণ

ওখানে গিয়েও তুমি একলা ওকে আনতে পারবে না। তোমার পেছনে দাঁড়াবার কেউ নেই। এই তিরিশ কোটি হিন্দুর সমাজ থেকে কেবল মাত্র একটা মানুষও তোমার সঙ্গে গিয়ে ওকে নেবার জন্যে সাক্ষ্য দেবে না, ওকে হিন্দুর মেয়ে বলে সৎকার করবার জন্যে হাত বাড়াবে না। আর যদি কাল ওখানে যাও, তা হলে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখবে, ওরা, আজকের ঐ মুসলমানের দল কাল আরো অনেক বেশী লোকজন নিয়ে, দলে দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে ওখান থেকে তাদের নিজের জাতের মেয়ে ফতিমাকে নিয়ে যাবার জন্যে একজোট হয়ে ভিড় করে হাজির হয়েছে। তোমার অসহায় দৃষ্টির সামনে ওরা বুক ফুলিয়ে ওদের বিবিকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তুমি আবার বুঝবে, এদেশে ঐ প্রতিমারা আজ কতবড় মিথ্যে, আমাদের, হিন্দুদের হিসাবের খাতায় তুচ্ছ একটা বাজে খরচা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি থামি। সুশান্ত চাপা স্বরে আস্তে আস্তে বলে ; দাদা !

আমি ওকে শান্ত করবার জন্যে আবার বলি, তবু তোমাকে একটা কথা বলি সুশান্ত। নিজের জীবনের দুর্ঘটনাগুলোকে বাদ দিয়ে যদি স্থিরভাবে ভেবে দেখ, তাহলে আমার কথাটাকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

সুশান্ত আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি আবার বলি, হিন্দুরা জাত আর ধর্মকে পবিত্র রাখবার জন্যে মুসলমানদের ছোঁয়া নিজের জাতের মেয়েকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু সংখ্যায় বেশী না হলেও এমন হিন্দু এখনো আছে, যে সেই মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্যে তাকে ভালবেসে আপন করতে চায়, তার প্রাণ আর মানকে রক্ষা করতে চায়। এদেশে যদি এদের মানুষ বলি, তাহলে ওদেশে,-ওই-পাকিস্তানেও এদেরই মত

গোটাকতক মানুষ এখনো বাস করছে বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে হবে। তারা হয়ত ধর্মে মুসলমান, তবু তারা পবিত্র পাকিস্তান কায়েম করবার নেশায় এখনও উন্মাদ হতে পারেনি, ধর্মের নামে মানুষকে মেরে, মানুষের ইজ্জৎ ধ্বংস করে তারা বাইরে মানুষের দেহ ধারণ করে ভেতরের মনটাকে এখনো হিংস্র পশু করে তুলতে পারেনি। একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য সুশান্ত। তারা ওখানে সংখ্যায় নগণ্য হলেও এখনো আছে ভাই। তাইত তারা খুনে ব্যাধের তাড়া খাওয়া ছোট্ট মমতাদের ধর্মের গোঁড়ামী ভুলে মানুষের মত মমতা দিয়ে আশ্রয় দেয়, জীবনমান রক্ষা করে, এমনকি নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসে।

এই দেশে, এই যুগে, এই আবহাওয়ায়, বেশীর ভাগ লোক একথা বিশ্বাস করতে না পারে। তবু একথা সত্য। দুস্তর ভয়ঙ্কর মরুভূমীর মধ্যে স্নিগ্ধ এতটুকু ওয়েসিসের মত, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অসীম সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপটির মত, এই রকম দু'একটা মানুষ এই বিশাল পৃথিবীর এদেশে ওদেশে এখনো আছে বলেইত এই পৃথিবীটা এখনো মানুষের বাসস্থান হয়ে টেঁকে আছে। এই মানুষগুলো না থাকলে গোটা পৃথিবীটাই যে রুক্ষ আর শুখনো হয়ে যাবে ভাই।

তাইত তুমি নিজেদের অতীত জীবনের লাঞ্ছনা আর বিপদ-টাকে স্মরণ করে ঐ বুড়ো মিঞা আর আহ্লাদ ভাইএর মানুষের মত কাজগুলোকে অবিশ্বাস্য বলে বাদ দিতে চাইলেও আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করব না। মমতাকে যদি বিশ্বাস করে থাক, মমতার গল্পটাকেও তাহলে বিশ্বাস করে নিও ভাই।

আর কোন কথা বলল না সুশান্ত। আমিও চুপ করে পার্কের ওপাশের রাস্তাগুলোর দিকে তাকিয়ে গাড়ীর আর মানুষের ভিড় দেখতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে আমরা দু'জনে বসে রইলাম। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, সুশান্ত, রাত প্রায় দশটা হল। চল যে যার বাড়ী ফিরে যাই।

সুশান্ত আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, কিন্তু দাদা, আমার কথা যে এখনো একটু বাকী আছে।

আমি তার পিঠে আমার একটা হাত রেখে বললাম, তা আমি জানি। তাই জন্যেইত একটু আগে বলেছি, যে ছেলেটা মুসলমানের ঘরে বাস করা মমতাকে বুকের সাহস নিয়ে আর নিজের ভালবাসা দিয়ে আপন করতে চায়, মমতার প্রাণ আর মান রক্ষে করতে চায়, আমাদের এই দেশে সেও একটা সত্যিকারের খাঁটি মানুষ। আমার ভাই সুশান্ত, সেই খাঁটি মানুষটা, মানুষের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তার মামাদের পাহাড়প্রমাণ রাগ আর বাধার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তা বেশত, তবু তোমার বাকি কথাগুলো না হয় আবার কাল সন্ধ্যের সময় বসে বসে শুনব। কাল অফিস থেকে বেরিয়ে এই পার্কের সামনেই এসে দাঁড়াব। তুমিও আসবে। প্রতিমার কথা মনে করে আজ যাকে দাদা বলে ডেকেছ, নিশ্চয়ই সেই দাদার এই সামান্য অনুরোধটা রাখবে। কেমন ?

আমি হাসিমুখ নিয়ে সুশান্তর মুখের দিকে তাকাই। সুশান্তও হেসে ফেলল। হালকা স্বরে বলল, যে সম্পর্ক ভালবাসা দিয়ে তৈরী হয়, তা কোনদিনই ভাঙ্গে না দাদা।

আমি চলতে চলতে তক্ষুনি বললাম, মমতাকে ঐ কথাটা বারবার বলবে সুশান্ত, তাহলে সে বেচারা অনেক ভরসা পাবে। দাদাকে ভোলাবার জন্যে এত বেশী মিষ্টি কথার দরকার হবে না।

তুজনেই হো হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠলাম।

বাইরে এসে সুশান্তকে চৌরঙ্গীর দিকের একটা ট্রামে তুলে দিলাম।

তারপর আমি শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে বসলাম।

চতুর্থ

মমতার কথা

তারপর দিন সকালে উঠে কালকের ঘটনাগুলো মনে করে কিন্তু নিজেকে ভারি বোকা বোকা মনে হল।

তাইত, কোথাকার কে আমার ঐ সুশান্ত যে তার জন্যে সারাদিন অফিসে কাজ করে সন্ধ্যে রাতটা আবার ঐ পার্কে বসে থেকে নষ্ট করব? সে মমতাকে বিয়ে করতে পারল আর না পারল, তাতে আমার কি আসে যায়? মুসলমানের ছোঁয়া মেয়ে বলে মমতাকে যদি সুশান্তের মামারা তাদের বৌ হিসাবে মানতে না চায় তবে তাদের ঘরের ঘটনা শুনে আমি তাদের কি সাহায্য করতে পারি? নিজের মনে নিজেকেই কড়া কড়া প্রশ্নগুলো করে বেশ শক্ত আর নির্লিপ্ত হতে চাইলাম। ঠিক করলাম, না আজ আর ও মুখো হব না। প্রতিমাও যেমন আমার কেউ ছিল না, তেমনি ঐ সুশান্ত বা মমতাও আমার কেউ নয়। মিছিমিছি ওদের ঝঞ্চাটে জড়িয়ে নিজেকে আর ব্যতিব্যস্ত করব না কিছুতেই।

কিন্তু চান করে ভাত খেতে খেতেই আমার একটু আগের শক্ত মনটা আবার কি জানি কেন নরম হয়ে গেল।

সুশান্ত ত জোর করে তোমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। প্রতিমার জন্য তোমার মনের সহানুভূতিটা বুঝতে পেরেই না সে নিজের মনটাকে তোমার সামনে খুলে দিয়েছে। সে এক মুহূর্তে একটা অজানা অচেনা মানুষকে দাদা বলে ডেকে নিজের আপনার জন করে নিতে চেয়েছে। নিজের দুঃখ আর সমস্যার কথাগুলো তোমার কাছে অকপটে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। তোমার ইচ্ছে না হয়, তুমি আর সুশান্তের কাছে যেও না কিন্তু যে চির দুঃখী মেয়েটার ভাই বলে সে তোমাকে তার আপনজন হিসাবে ভাবতে চেয়েছে, সেই ছেলেটাকে এড়িয়ে গিয়ে সেই মেয়েটাকে তুমি আজই এমনভাবে অপমান কোর না।

মনের সওয়াল শুনতে শুনতে প্রতিমার সেই করুণ মুখখানা যেন সামনে দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম, শক্ত মনটা ভেতরে নিঃসাড়ে গলতে আরম্ভ করেছে, কড়া যুক্তি দিয়ে তাকে ধরে রাখবার জোর আমার নেই।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে পড়লাম। জামাকাপড় পরতে পরতে মাকে ডেকে বললাম, আজ হয়ত বাড়ী ফিরতে একটু রাত হবে মা। কিছু ভেব না যেন।

সন্ধ্যের সময় পার্কটার সামনে এলাম। দেখি, সুশান্ত গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে হাসিভরা মুখে বলল, সেই ছ'টা থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি দাদা, দেরী দেখে ভয় হচ্ছিল।

ভাবছিলাম, বুঝি খুব বিরক্ত হয়েছেন। কোথাকার কে একটা

উড়ো মানুষ, তার জন্যে রোজ রোজ মাঝপথে নেমে এত কষ্ট করা কেন ?—যাক, মনটা আমার হালকা হল এবার।

আমি ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলাম। ঠিক এই কথাইত সকালে মনে হয়েছিল।

তবু উপরে সহজ গলায় বললাম, চল সুশান্ত, ভেতরে গিয়ে কালকের মত দু'জনে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসি।

সুশান্ত হাসতে হাসতে বলল, আজ আর পার্কের নিরিবিলি জায়গায় বসা হবে না দাদা।

আমি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন সুশান্ত ? সুশান্ত বলল, আজ আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে। চট করে প্রতিমার কথাটা মনে এল। তবে কি সুশান্ত আজ আবার প্রতিমার জন্যে আমাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে চাইছে ?

সুশান্ত বুঝতে পারল আমার ইতস্তত ভাবটা। সে ভারি গলায় বলে উঠল, না দাদা, বেশ বুঝতে পেরেছি, কোন জোর দিয়েই আমরা ওদের কাছ থেকে দিদিকে আনতে পারব না। তার চেয়ে ফতিমার দেহটাকে ওরা দল বেঁধে নিয়ে যাক। তাইত আমি ও রাস্তাটা দিয়ে আজ আসতে পর্যন্ত পারলাম না। ওদিকে ফিরে তাকাব না বলেই অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসেছি। ওর মনের কষ্টটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম ভেবে বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ওকে আবার সহজ করবার জন্যে এবার তাড়াতাড়ি বললাম, ও সব কথা ভুলে যাও ভাই। এখন বলত শুনি, কোথায় যেতে হবে তোমার সঙ্গে। আমিত ঠ্যাং দুটোর ষ্টিয়ারিং ধরে দাঁড়িয়েই আছি। গন্তব্যস্থলটা কোনদিকে জানতে পারলেই এক্ষুনি টাং টাং করে চরণগাড়ীর গতিবেগটা চড়িয়ে দেব।

সুশান্তর ভারি মুখখানা এক মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল। সে

হেসে ফেলে বলল, পায়ে হেঁটে গেলে অনেক দেরি হবে দাদা। আর তা ছাড়া ট্রামবাসের রাস্তার ধারেই আমরা নামব। ওদিকে মমতা আপনি যাবেন বলে নিশ্চয়ই বসে আছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সেকি, তাহলে তুমি আমাকে মমতাদের ওখানে নিয়ে যাবে নাকি? সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমি নিয়ে যাচ্ছি না দাদা। আজ সকালে মমতাদের বাসায় গিছিলাম। ওর কাছে আপনার সব গল্প করেছি। বলেছি, এই সহরে এতদিন পরে আমি আপনার লোক খুঁজে পেয়েছি। সে আমার হারিয়ে যাওয়া বোনের ভাই হয়েছিল, তাই সেই সম্পর্কে সে আমারও ভাই।

কিন্তু মমতা সব শুনে হাসতে হাসতে বলল কি জানেন? বলল, তাহলে ত তিনি মমতারও ভাই। মমতার বড় দাদা। তবে তুমি একটা কাজ কর। আজ আর তাঁর সঙ্গে পার্কে বসে গল্প কোর না। তাঁকে এখানে, আমাদের শ্যামবাজারের বাসায় নিয়ে এস।

আমি ওর কথা শুনে যেই বললাম, তুমি বললেই অমনি তিনি আসবেন নাকি?—তক্ষুনি সে আর কোন কথা না বলে একখানা কাগজে সরসর করে খানিকটা কি লিখে সেটাকে ভাঁজ করে আমার হাতে দিয়ে বলল, দাদা এলে তার হাতে এই কাগজখানা দেবে, তারপরে দেখ, মাবাপহারা ছোট বোনের ডাক শুনে তিনি আসেন কিনা।

সুশান্ত পকেট থেকে কাগজখানা বের করল। আমার হাতে দিয়ে বলল, ওর লেখাটা আমি পড়িনি। ওতে কি বলেছে পড়ুন ত দাদা।

আমি কাগজটাতে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

"......... দাদা, আজ সন্ধ্যের সময় সুশান্তবাবুর সঙ্গে এখানে এসে

ছোট বোনটির হাতের চা খাবেন। আর নেহাৎ যদি না আসেন। তাহলে বুঝব, সুশান্তবাবুর মুখ থেকে আমার সব কথা শোনবার পরে মুসলমানের ঘর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বলে আর পাঁচজনের মত আপনিও আমার হাতের ছেঁায়া খাবার খেতে ঘেন্না করে এলেন না। অভাগী বোনটা আপনাদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকবে।—আপনার মমতা।........"

চিঠিখানা আবার সুশান্তের হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

সুশান্তের কালকের বর্ণনাগুলো মনে ভেসে উঠল। আশ্রমে আশ্রয় পেল আট বছরের মেয়েটা। আঠের বছরে আশ্রম জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের যোগ্যতা বলে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াল। তবু তাকে মেয়ে মানুষের আকাঙ্খিত জীবনে কিছুতেই দাঁড়াতে দেবে না সুশান্তের মামারা। সে যে মুসলমানের ছেঁায়া মেয়ে। তাই তার মেয়ে জীবনের পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সততা আর পবিত্রতার এক কানাকড়িরও দাম নেই ওইসব ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান জাতরক্ষার ধ্বজাধারী মামাদের কাছে।

হঠাৎ সুশান্তের ডাকে আমার চমক ভাঙ্গল, দাদা, চলুন এবার।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, হ্যাঁ ভাই, চলো।

আমি রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম।

সুশান্তই এবার ঠাট্টার স্বরে বলল, কিন্তু দাদা, এখনো ঐ চরণ গাড়ীতে চড়ে এতটা পথ যাবার জন্যে ষ্টিয়ারিং দুটোকে এত চট পট এগিয়ে দিচ্ছেন নাকি ?

আমি থেমে গেলাম। ওর দিকে ঘুরে হেসে ফেলে বললাম, না ভাই, আর ঠুকঠুক করে চরণ গাড়ীতে যাবার সময় নেই। ওই দেখ, একখানা বাস আসছে। তাই তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়েছি। কি জান সুশান্ত, ক্ষিধেয় পেটটা জ্বলে যাচ্ছে যে। সেই সকাল

ন টার সময়ে দুটো ভাত খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। মমতা চায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই টাও কিছু রেখেছে। খেলে তবে পেটের জ্বালাটা জুড়োবে।...হাসতে হাসতে দু'জনে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালাম।

শ্যামবাজারের বড় রাস্তার ধারেই বাড়ীখানা। পুরোন আমলের দোতলা বাড়ী। দোতলার ওপরে রাস্তার দিকে ছাদ আঁটা লম্বা বারান্দা। সুশান্তের সঙ্গে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার বারান্দার কোলে পাঁচছ'খানা ঘর। সুশান্ত আমাকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দার উপর দিয়ে একেবারে শেষের ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজা খোলাই ছিল তবু সুশান্ত ঘরের সামনে এসে ডাকল, মমতা।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে এল মেয়েটা।

এই মমতা। মমতা করবার মতনই চেহারাটা বটে। টকটকে সুন্দর মুখখানাতে টানাটানা অথচ ভাসাভাসা চোখ দুটো বড় শান্ত দেখাচ্ছে। মমতার মুখে হাসি লেগে আছে তবু মনে হল ঐ হাসির সঙ্গে একটা করুণ ভাব যেন এক হয়ে মিশে আছে। এ মেয়েকে যে দেখবে, তারই মনে মায়া হবে। আমিত আগেই ওর সব কথা শুনে নিয়েছি। এখন ওকে দেখে আমার মায়া যেন শতধারে ঝরে পড়তে লাগল।

সুশান্তটার পছন্দ আছে বুঝলাম।

একখানা সাদা শাড়ি পরেছিল মমতা। শাড়িটা গায়ে মাথায় জড়িয়ে মমতা বেরিয়ে এল। আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আমার পা দুটো ছুঁয়ে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, সারাটা দিন খাটাখাটুনির

পর এখানে টেনে এনে বড় কষ্ট দিলাম দাদা। কিন্তু বাপমাহারা এই ছোট বোনটার মুখ চেয়ে কক্ষনো রাগ করবেন না জানি। আর সেই জন্যেই ত কাছে ডেকে আনতে সাহস পেলাম।

মমতার আপন করা কথায় আমিও যেন কথা খুঁজে পেলাম। আমি তক্ষুনি হাসতে হাসতে বললাম, আমি বিষম রাগ করেছি মমতা। সারাটা দিন খেটে খেটে এখন ক্ষিধেয় পেটটা আমার চোঁ চোঁ করছে। এ সময় বোনেরা কোথায় একগাদা খাবার আর এক কেটলী গরম গরম চা সামনে এনে ধরবে। পেটটা পূরে খেয়ে তবে ত প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। তা না করে কেবল খালি মুখে বোনের ইনিয়ে বিনিয়ে বানান চাট্টিখানি মিষ্টিকথা শুনলেই কি ঢাকের মত ঢপঢপে ফাঁপা উদরের খোলটা ভরে যাবে। শিগগীর মিষ্টি মিষ্টি খাবার দাবার খেতে দাও আগে, নইলে তোমার মিষ্টি কথার বদলে অনেক কড়া কড়া কথা রাগ করে শুনিয়ে দেব বলছি।

মমতা মুচকি হাসির সঙ্গে বলল, তা' এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বোনের সঙ্গে এমনি করে ঝগড়া করলেই কি সারাদিনের খালি পেটটা আপনা থেকে ভরতি হয়ে যাবে? আগে ঘরে এসে বসুন দেখি, চায়ের জল তৈরী হল বলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বোনটা তার দাদার খাবার সামনে এনে দেবে।

আমরা ঘরের ভেতর ঢুকলাম। ঘরটার এক পাশে কতকগুলো তোষক বালিশ গোটান রয়েছে। আর একধারে দেওয়ালের তাকে কাপ ডিস, তেলের শিশি, সাবান, এইরকম সব টুকিটাকি জিনিষ পত্তর সাজান আছে। একটা কাঠের আলনায় দুটো তিনটে শাড়ি কোঁচান রয়েছে। মাঝারি সাইজের দুটো তোরঙ্গ এককোনে ছিটের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

মমতা একটা ছোট মাদুর এনে পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝের উপর বিছিয়ে দিল।

আমি বসে পড়লাম। সুশান্তর দিকে ফিরে বললাম, কি হে ডাক্তারবাবু, তোমার ত দেখছি মুখে কোন সাড়াশব্দই নেই। আর তা থাকবেই বা কেন বল? হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে সারাটা দিন চপকাটলেট মামলেট মুখে পুরে পুরে মুখটা একেবারে বুজে গেছে দেখছি। এই উপোসী দাদার খিদের কষ্টটা কি করে বুঝবে ভায়া!

হেসে উঠল সুশান্ত। তারপর বলল, আজ দুপুরে হাসপাতালে আমার কোন ডিউটিই ছিল না ত। কাল রাতে আপনার কাছ থেকে গিয়ে রাত দশটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত হাসপাতালে কাজ করে মামাদের বাড়ী গেছি। তারপরে চান করে জলখাবার খেয়ে মমতাদের এখানে এসেছি। এখান থেকে মামাদের বাড়ী গিয়ে লম্বা এক ঘুম দিয়েছি। ঘুম থেকে উঠেই আপনার জন্যে পার্কটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছি। তাহলে মুখে চাপকাটলেট আর মামলেটগুলো কখন পুরবো বলুন ত দেখি?

আমি তক্ষুনি সহানুভূতির স্বর করে বলে উঠলাম, আহারে, তবে ত আমার বলাটা বড় ভুল হয়ে গেছে। তাইত, তাইত দেখছি ভায়া। বিকেল থেকে রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখখানা একেবারে চুপসে গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারও দুঃখ ঘুচবে ভায়া। আর মমতার খাবারগুলো আমি কি আর একলাই খেয়ে ফেলব ভাবছ? এসো, এখানে এবার হাত পা গুটিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বোস। তবে ত দু'ভায়ে বসে একসঙ্গে মমতার খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাবে

সুশান্ত বসল না। হাসতে হাসতে আবার বলল, আপনি

বসুন। আমি এর মধ্যে চট্ করে একবার ঘুরে আসছি। আমি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে সুশান্তের দিকে তাকালাম।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল মমতা। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, সুশান্তবাবু দোকান থেকে দুটো মিষ্টি আনতে যাচ্ছেন। আমি এর মধ্যে চা টা ছেঁকে কাপে ঢেলে নিয়ে আসছি দাদা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বললাম, এই সুশান্ত, শুধু দুটো মিষ্টি, আর কিছু না ?

সুশান্ত দরজার বাইরে চলে গিছিল। সেইখান থেকেই সে আমাকে শুনিয়ে জবাব দিল, শুধু মিষ্টি নয়, মিষ্টির সঙ্গে কিছু টিষ্টিও আনব দাদা। কচুরি, সিঙাড়া, নিমকি, আর খানচার পাঁচ ভেজিটেবল্ চপ্, ...

চোপ ! ...... আমি যেন তর্জন করে উঠলাম।

আমি ওসব দোকানের খাবার খাব না আজ। ও গুলোত রোজই গপ্ গপ্ করে গিলি। মমতা ভেবেছে কি ? দোকানের ভেজিটেবল তেলে ভাজা কতকগুলো বাজে খাবার খাইয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেবে ? এত বোকা আর পেটুক এ শর্মা নয়। তুমি ফিরে এস হে সুশান্ত। ঐ ত দেখতে পাচ্ছি, ঘরের কোনে একটা ষ্টোভ রয়েছে। এরপর আমি হাতগুনে বলতে পারি সুশান্ত, সেলফের ঐ তাকে ভাল ঘি, ময়দা, নুন, চিনি, সবই মজুত আছে, এখন ঘরে এসে ষ্টোভটা জ্বালিয়ে দাও দেখি। এরপর মমতা তাক থেকে ময়দা নিয়ে বেশ করে মাখুক আর কড়া চাপিয়ে ঘি ঢেলে দিক। তারপর গরমগরম এক একখানা ফুলকো লুচি ভেজে ভেজে থালায় ফেলে দেবে আর আমরা দু'ভায়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিয়ে মনের সুখে চক্ষু বুজে বোনের হাতের তারিফ করব। কেমন মমতা ?

মমতার দিকে তাকালাম।

মমতা নিচের দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমার খুশীমাখান জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিল না।

দরজার বাইরে গেলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলো শুনেছিল সুশান্ত। সুশান্ত চলে গেল না। সে আবার ঘরের মধ্যে এল। আমার দিকে মুখ তুলে শান্ত গলায় বলল, কিছু মনে করবেন না দাদা। মমতা তার নিজের হাতে রেঁধে আপনাকে খাওয়াতে সাহস করে নি। ওর সব কথা শুনে অনেকেই খেতে চায় না কিনা। তাই আমাকে বলেছিল, দাদা এলে তুমি বাজার থেকে খাবার এনে দিও। আমি উষাদির উনুন থেকে উষাদির হাতের চা করে এনে দেব।

আমি সুশান্তের কথাগুলো শুনে খানিকটা যেন হক্‌চকিয়ে গেলাম। হঠাৎ কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

কেন, মমতার হাতে কি নোংরা পাঁক মাখান আছে, যে ওর হাতের তৈরী খাবার খেলে সে খাবার পর্যন্ত নোংরা হয়ে যাবে। ঐ ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত মেয়েটা। ওর ঐ চেহারার মধ্যে ময়লার বা নোংরার এতটুকু ছাপ নেই। বরং ভাল করে দেখলে বলতে ইচ্ছে হয়, ঐ পবিত্র লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মেয়েটা কি জাতে হাড়ি মুচি ডোম মেথর কিংবা খ্রীষ্টান বা মুসলমানের মেয়ে যে ওর ছোঁয়া খাবার খেলে গোঁড়া হিন্দু হিসেবে আমার জাত অপবিত্র হয়ে যাবে?

আমি মনে মনে হিসেব করে আসল ব্যাপারটা গুছিয়ে বোঝবার আগেই সুশান্তের গলার স্বর শুনতে পেলাম, হাসপাতালে পর্যন্ত ওর বান্ধবী নার্শদের অনেকে এখন ওর হাতের খাবার খায় না। আগে সবাই খেত কিন্তু মমতা এক সময়ে মুসলমানদের বাড়ীতে

ছিল, এই খবরটা শোনবার পর থেকে ওরা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ওকে এড়িয়ে চলে।

ওর ঘরে আর একটি মেয়ে ওর সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভাড়া দিয়ে থাকত। কোন একটা অফিসে টাইপ করে মেয়েটি। সেও কারো মুখে ওর ঘটনাগুলো জানতে পেরে প্রায় মাসখানেক হল অন্য কোথাও উঠে গেছে। যাবার সময় জানিয়ে গেছে, সে কায়েতের কুমারী মেয়ে। তার বিয়ের প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ সময়ে তার ভাবী স্বামী বা তার আত্মীয় স্বজন কেউ যদি টের পায় যে সে মুসলমানদের ঘরের ভাত খাওয়া একটা জাতিচ্যুতা অনাথ আশ্রমের মেয়ের সঙ্গে থেকে তার হাতের এঁটো খাবার খায়, তাহলে তার বিয়েতে অনেক বাগড়া পড়তে পারে। সে কলকাতার কাছের কোন জায়গা থেকে এসে চাকরীর সুবিধের জন্যে মমতার সঙ্গে একঘরে থাকত, খাওয়া দাওয়াও করত। তার কোন ভাই বা দাদা এসে মমতার খবরটা বের করেছে, তার পরেই বোনকে এখান থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে গেছে।

সুশান্ত থামে। থমথম করে ঘরটা। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ভার আবহাওয়াতে চাপা পড়ে যায় আমার সাধারণ বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত।

তবু আমি নিজেকে জোর করে টেনে তোলবার জন্যে বলে ফেলি, কিন্তু আজকালত এসব বাছবিচার আমরা করিনা সুশান্ত। গাঁয়ে ঘরে হয়ত এইরকম ঘটনাকে নিয়ে ঘোঁটপাঁচা আর ছাড়াছাড়ি এখনও কিছু কিছু চলতে পারে। তবে সহরে এসব জাত আর ধর্মের বিচার করে এ যুগে কে আবার কোথায় কোন বিশেষ জাতের বা ধর্মের মানুষের হাতের তৈরী খাবার খেতে অস্বীকার করে? হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে বা চায়ের দোকানে হাজার হাজার

হিন্দুর ছেলেমেয়ে রোজ ত ঢুকছে, খাবার বল, চা বল, ডালভাত রুটী তরকারী বল, সবার হাতের সব কিছু খাগু দাম দিয়ে কিনে হাসি ঠাট্টা করে খাচ্ছে! কৈ সেখানে ত আমরা একদিনও, এমনকি একবারের জন্তেও কোন মানুষটা এসব রাঁধল, কে খাবারগুলো হাতে করে ছুঁয়ে আমাদের সামনে সাজিয়ে দিল, তারা ভাল জাতের লোক কি নিচু জাতের মানুষ, তারা হিন্দু কিংবা খ্রীষ্টান কিম্বা মুসলমান এসব চুলচেরা বিচার করে জাতের মহিমা বজায় রেখে পেটের ক্ষিদেটাকে মেটাতে চাইনা। তবে মমতার হাতের তৈরী খাবার খেলে ঐ সব নার্শদের জাত যাবে কেন, ঐ কায়স্থদের কুমারী মেয়েটার স্বজাতির ঘরে বিয়ে হবে না কেন?

আমি যেন খানিকটা অবুঝ হয়ে পড়ি। সুশান্তের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখি।

সুশান্তই যেন আমাকে বুদ্ধি দেবার জন্তে আবার বলল, হোটেলে রেষ্টুরেন্টে আমরা প্রায় সবাই খাই দাদা। শুধু হিন্দুদের দোকানে নয়। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী চীনে, আর সাহেবী হোটেলে গিয়ে ফুর্তি করে দেশী আর বিদেশী খাবার খেতে আমরা, ছেলেরা মেয়েরা হামেশাই ঢুকছি। এমন কি অনেকে আত্মীয় স্বজনদের চোখ এড়িয়ে মুসলমানদের হোটেল রেষ্টুরেন্টে ঢুকেও কোপ্তা কাবাব গোস্ত রুটি খেয়ে-খুশী মনে বেরিয়ে আসছে। সহরের লোকেরা, এমন কি সহরের বাইরের অনেক লোকেও একথা জানে। জানে, হাতে পয়সা থাকলে যে কোন জায়গায় যে কোন খাগু সখ করে খাওয়া যায়। আর এই খাওয়ার কথা সাহেবীআনার নকলকারী শিক্ষিত হিন্দুর সংসার থেকে আরম্ভ করে ধর্মের নামে অনুরক্ত বাড়ীর লোকজনেরাও বেশ খোলাখুলিভাবে বরাবর জেনে আসছে। এর বেলা এরা সবাই সব জেনেও সব কিছুই সহজভাবে

স্বীকার করে নেয়, কিম্বা সব বুঝেও তাদের হিন্দু ধর্মের সনাতন অস্তিত্বটা তাদের বাড়ীর ভেতর ঠিক অবিকৃতভাবে এখনো যথেষ্ট বজায় আছে মনে করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।

হাসতে হাসতে সুশান্ত আবার বলে, না দাদা, এসব খাওয়াতে আমাদের ধর্মের পাথরের দেওয়ালটাতে এতটুকু ফাট ধরে না। কিন্তু যেই আমরা লোকের মুখে শুনে জানতে পারি যে অমুকের মেয়েটাকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে গেছে, মুসলমানদের ঘরে বন্দী হয়ে একদিনের জন্যেও সে মুসলমানদের হাতের খাবার খেয়েছে, অমনি কি সহরের যত্রতত্র আর যারতার সঙ্গে ভোজনকারী আপটুডেট মানুষ, কি গ্রামের শুচিতারক্ষাকারী সমাজসচেতন মানুষ, সবাই সেই মেয়েটার সঙ্গে একজায়গায় বসে খাবার কথা চিন্তা করতে শিউরে ওঠে। তখন সেই মেয়েটার হাতের রান্না খাদ্য খাওয়া তো দূরের কথা, তার হাতের স্পর্শ করা ঐ খাদ্যবস্তুটা পর্যন্ত হিন্দুর ধর্মনাশকারী একটা কলুষিত আর নিষিদ্ধ ভোজ্য হয়ে পড়ে। লোকের আড়ালে আবডালে যদিও বা কোনদিন খেয়ে থাকে, তাতে বিশেষ দোষ হয়েছে বলে মনে করে না কিন্তু ওরে সর্ব্বনাশ!·······পাঁচজন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা চেনাজানা লোকের সামনে ঐ মুসলমানদের ঘর করা মেয়েটার হাতের খাবার খেয়ে নিজের ঘর নষ্ট করে শেষটাতে ভবিষ্যতে স্বামীর ঘরেও বিনাকুৎসায় প্রবেশ করার পথটা নষ্ট করবে কোন বুদ্ধিমতী হিন্দুর মেয়ে?

তাইত বলছি দাদা, হতে পারে মমতার বন্ধুরা নার্শ কিম্বা অফিসের চাকুরে মেয়ে, তারা হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে ঘোরাফেরা করে খেতে যেতে পারে কিন্তু নিজের জানাশোনা মানুষের চোখের সামনে ঐ ধর্মের গণ্ডী থেকে বার করে দেওয়া মেয়েটার হাতের

খাবার নিয়ে মুখে দেবার আস্পর্ধা! ওরে বাবা, এতবড় দুর্মতি ওদের হবে কোন সাহসে! সহরে বাস করে আধুনিক যুগের হাল ফ্যাসানের মেয়ে হয়েছে বলে ওরা ধর্মের পথে এতবড় কাঁটা দেবে কোন অধিকারে। ওদের বিয়ে করতে হবে না, জাতের খাঁটি মেয়ে হিসেবে নিজের সংসার জীবনে ঢুকতে হবে না?

আপনি এতসব কথা তলিয়ে না ভেবে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে আছেন দাদা। এখনো কি বুঝে উঠতে পারছেন না, কেন ওরা, মমতার ঐ নার্শবন্ধুরা মমতার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেও সবার চোখের সামনে ওর হাতে খেতে চায় না, কেন কায়স্থদের ঐ চাকুরে মেয়েটা তার আত্মীয় স্বজনদের জানাজানির পর আর মমতার ঘরে একসঙ্গে থাকতে চায় না? মমতা ওদেরই মত মেয়েমানুষ হলে কি হবে, ওরা জানতে পেরেছে, মমতা এক সময়ে মুসলমানদের আশ্রয়ে মুসলমানের হাতের খাদ্য খেয়ে তার হিন্দুত্বের জীবনের অধিকার থেকে চিরজীবনের মত বাইরে চলে গিয়েছে।

হা হা শব্দে ঘর দোর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল সুশান্ত। হাসতে পারলাম না আমি। তবু কোন রকমে চোখ তুলে একবার মমতার দিকে তাকালাম।

অচল পাথরের মূর্তির মত মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

আমি যে কি বলব আর ওদের সামনে এরপর কি করব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

এইরকম অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে আমরা সবাই কতক্ষণ ডুবে ছিলাম, তা' জানি না। তবে হঠাৎ একসময় সুশান্তের গলার স্বরে আমি আবার যেন নতুন করে মনের নিরাশ ভাবটাকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে সুশান্তের দিকে তাকালাম।

সুশান্ত বলল, তাহলে আমি এখন যাই দাদা !

এবার অমি নিজেকে তৈরী করে নিয়েছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। মমতার কাছে গিয়ে তার পিঠে আমার ডান হাতখানা রেখে বেশ শক্তগলাতেই বললাম, সুশান্ত, তোমার সব কথা শুনেও আমি বলছি, আমি আমার ছোট বোনটির কাছেই এসেছি। অন্য লোকে মমতাকে কি চোখে দেখে বা ভাবে এসব আমার জানবার দরকার নেই। তবে তুমি শুধু জেনে রাখ ভাই, আট-দশ বছর আগে আমার একমাত্র বোন মরে গিছিল। ভেবেছিলাম, যে চলে গেছে তাকে আর এ পৃথিবীর কোনখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখানে এসে বুঝেছি, আমার সেই দুঃখটা মস্ত বড় একটা ভুল। তাকে এতদিন পরে আমি এই ঘরে এসে আবার খুঁজে পেয়েছি। তাকে দেখতে ছিল ঠিক এই মেয়েটারই মত। ঠিক এই মমতারই মত। ভাইএর বোনকে চিরকাল বোনেরই মত দেখতে হয় ভাই। বোনকে চিনে নিতে ভাইদের বেশী দেরী হয় না।

হাসবার চেষ্টা করে মমতার মুখের দিকে আর এবার তাকাই।

দেখলাম মমতা দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। তার দু'হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল টস্ টস্ করে মেঝেতে ঝরে পড়ছে।

তবু সুশান্ত একবার বাজারে গিছিল। তবে দোকানের তৈরী খাবার কিনে আনতে গেলনা, গেল আমাদের খাবার তৈরী করবার জন্যে কতকগুলো কাঁচা জিনিষপত্তর কিনে আনতে।

খানিকটা পরে আমরা দু'জনে বসে বসে খাচ্ছিলাম। মমতা লুচি ভেজে আমাদের এক একখানা করে দিচ্ছিল।

মমতা হাসিমুখে বলল, এরমধ্যে ও কথা বললে শুনব না

দাদা। মাছের দাগাগুলো দিয়ে যে তরকারীটা করেছি সেটাকি আপনাদের কেবল খানকতক লুচি আর আলু চচ্চড়ি দিয়ে নিজে একলা বসে গিলবার জন্যে নাকি? পেটে ধরছে না বললে শুনব না। মাছ কখানা খেতেই হবে।

মমতা তাড়াতাড়ি মাছের তরকারীটা আমার আর সুশান্তর পাতেই সবটুকু ঢেলে দিল।

আমি সুশান্তের দিকে তাকিয়ে বললাম, বুঝলে সুশান্ত, মেয়েদের এই এক অদ্ভুত স্বভাব। সব আমাদের না খাওয়ালে ওরা কিছুতেই তৃপ্তি পায় না।

খেতে খেতে সুশান্ত বলল, যা বলেছেন দাদা। রান্নাটাও বেশ চমৎকার হয়েছে।

আমি ওকে সায় দিয়ে বললাম, বেড়ে বলেছ ভাই। তবে তোমার ত মমতার হাতের রান্না বেশ না হলেও ভাল লাগবেই সুশান্ত। কিন্তু আমার যখন ভাল লেগেছে, তখন বুঝতে হবে মমতার হাতের রান্নাটা নিশ্চয়ই ভাল।

সুশান্ত আমার ঠাট্টা বুঝতে পেরে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। আমি এবার বললাম, না ভাই, ঠাট্টা করে বলছি না। সত্যি মমতা, বলত তুমি, এমন সুন্দর রান্নার হাত পেলে কোত্থেকে? এ যে পাকা রাঁধুনীর স্বাদ!

মমতা উজ্জ্বলমুখে বলল, আমার মনে আছে, পাড়ার লোকে বলত, আমার মা'র রান্না নাকি খুব ভাল ছিল। তবে মায়ের কাছ থেকে রান্না শেখবার সুযোগ আমি আর জীবনে পেলাম না। কিন্তু আশ্রমে থাকতে একটু বড় হবার পর রান্না করা আমাদের শিখতে হত। সব মেয়েই রান্না শিখে পালা করে রাঁধত। ওই আশ্রম জীবনেই আমার রান্নাবান্নার হাতে খড়ি।

আশ্রমের কথা উঠতে আমি মমতাকে আর কতকগুলো কথা যেন জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ খুঁজে পেলাম। আমি খেতে খেতে আবার বললাম, আচ্ছা মমতা, সুশান্তের কাছে শুনলাম, তুমি যখন আশ্রমে এসেছিলে তখন তোমার বয়স আট ন' বছর। তাহলে তোমারত বেশ মনে আছে, আজাদ কিভাবে তোমাকে পাকিস্তান পেরিয়ে এদেশে এনে রেখে গেল। কিন্তু কৈ, তুমি ত সেকথা ঐ আশ্রমের লোকদের সবকিছু বলতে পারনি।

মমতা বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে বলল, না দাদা, সুশান্তবাবুর মুখে কতটুকু শুনেছেন তা আমি জানি না। তবে জানি, সুশান্তবাবু যতটা আপনাকে বলেছেন, তার চেয়ে বেশী আমিও আপনাকে জানাতে পারব না। কেন না, আজাদ ভাইএর সঙ্গে কখন আমি গাড়ীতে ওদেশের সীমানা পেরিয়েছি তাও যেমন বুঝতে পারি নি, আবার আমাকে ষ্টেশনে রেখে আমার ঘুমের মধ্যে সে কখন চলে গেছে, তাও কিছু জানতে পারি নি। তবে এখনো আমার মনে পড়ে, ট্রেনটা ওদেশের সীমানা পেরোবার বেশ খানিকটা আগে আজাদভাই আমাকে আমার নিজের ফ্রকটা হাতে দিয়ে বলেছিল, আমাদের জামাটা খুলে তোমার জামাটা এবার গায়ে দিয়ে নাও বোন। নাহলে এটা নামবার সময় ভীড়ে হারিয়ে যেতে পারে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করে ফ্রকটা পরেছিলাম।

চুপ করল মমতা। আমি তবু বললাম, কিন্তু যতদূর জানা যাচ্ছে, যারা তোমাকে আশ্রমে নিয়ে গিছিল, সেই আশ্রমের লোকজনও আজাদ ভাইকে দেখেনি, তারা শুধু তোমার মুখ থেকে শুনেছিল।

মমতা ঘাড় নেড়ে ছোট্ট করে বলল, তাইত শুনেছিল। আমি

একটু থেমে আবার বললাম, তবে আজাদকে যখন কেউ দেখেনি, তখন তুমি এসব কথা ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে গেলে কেন মমতা ? অত ঘটনা না বলে শুধু বললেইত পারতে যে তোমার মাবাপকে পাকিস্তানী মুসলমানরা দাঙ্গায় মেরে ফেলেছে আর তুমি কোনরকমে ছটকে বেরিয়ে এসে এদেশ পালিয়ে এসেছে। উনিশশ পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার কথাও সবাই জানত। এমন ত শত শত মেয়ে প্রাণ নিয়ে একবস্ত্রে একলা চলে এসেছে।

মমতা কি যেন ভাবল। তারপর আমার দিকে মুখতুলে আবার বলল, আট ন' বছরের একটা মেয়ে কি এত বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলতে পারে দাদা ? তাই আমি আমার জীবনে তখন যা ঘটেছিল সেটাই সবাইকে বলেছিলাম। আর এ ছাড়া আর একটা কথা কি জানেন দাদা ?

দেখলাম, মমতার চোখ দুটো আরো বড় বড় হয়ে উঠেছে। চোখের ভেতর থেকে যেন একটা আলোর দীপ্তি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু উত্তেজিত স্বরে মমতাই আবার নিজের জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্য বলল, কিন্তু কথাগুলো সেদিনও যেমন বলেছি, এরপর যদি আবার কেউ ওগুলো নতুন করে শুনতে বা জানতে চায়, তাহলে সত্যি ঘটনাগুলো চাপা না দিয়ে আমি বারবার তেমনিভাবে ঐ এক কথাই বলে যাব। বলে যাব, ওরা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল, আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, আমার ধর্মের পবিত্রতাকে রক্ষে করেছিল, আর মুসলমানের ছেলে হয়েও আজাদ ভাই আমায় নিজের বোনের মত কোলে করে এখানে রেখে গিছিল। ঐ মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঐ রাক্ষসপুরীর ভেতরে বাস করেও যে মানুষগুলোর স্নেহের স্পর্শে আমি আমার প্রাণ আর মান ফিরে পেলাম, কিসের স্বার্থে, কিসের সুখের সন্ধানে

আমি নিজে একজন মানুষের মেয়ে হয়ে সেই জ্বলন্ত সত্যটাকে মিথ্যের মধ্যে চাপা দিয়ে একটা মনগড়া গল্প তৈরী করে বলে যাব ?

অস্বীকারের ভঙ্গিতে মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে সে আবার বলল, তা আমি কোনদিনই বলতে পারব না দাদা। নিজের কোন সুখ বা সুবিধের জন্যে এমন করে বানান মিথ্যে আমি এ মুখ দিয়ে ভুলেও যেন উচ্চারন না করি !

থামল মমতা। আমরা চুপ করে খেতে লাগলাম। মমতার স্পষ্ট কথাগুলো আমার মনের মধ্যে বাজতে লাগল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এ মেয়ে মরে গেলেও আত্মমর্যাদা হারাবে না, জগতের সমস্ত ঐশ্চর্য আর ভোগের বিনিময়েও ভেতরের মনুষ্যত্বকে ছোট করবে না।

মমতার উপর আমার মমতাটা যেন আরো খানিকটা বেড়ে গেল। আমার মনে হল, মমতা সত্যিই অমার নিজের ছোট বোন। আরো মনে হল, মমতার ভেতর এমন একটা আকর্ষণশক্তি আছে, যার টানে ওকে যে-ই দেখবে, সে-ই আপনার মনে করে ভালবাসতে বাধ্য হবে। আজাদও ওকে ওর ওই শক্তির জন্যেই মুসলমান হয়েও নিজের বোনের মত রক্ষে করেছিল। আমিও ওকে যত দেখতে লাগলাম আর ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলাম, ততই আমার মনে হতে লাগল, মমতাকে আমি যেমন করে পারি রক্ষে করবার চেষ্টা করব। সুশান্তর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যাতে মমতার বিয়ে হয়, যাতে এই স্রোতে ভেসে যাওয়া ফুলের মত সুন্দর মেয়েটা সুশান্তের মত যোগ্য ছেলের হাতে পড়ে আবার বাঁচতে পারে, আবার জীবনে সত্যিকারের আশ্রয় লাভ করতে পারে, তার জন্যে আমার যতটুকু সাধ্য দায়িত্ব বহন করব।

আমি ভিতরে উৎসাহ আর উত্তেজনা অনুভব করে সুশান্তকে লক্ষ্য করে বললাম, চল সুশান্ত, কালই সন্ধ্যের সময় আমি তোমার মামাদের দোকানে যাব। আমি ওঁদের আবার বোঝাব, ওরা যা ভেবেছেন, সে সব ধারণা মিথ্যে। মমতা আজও হিন্দুর মেয়ে। হিন্দুর ঘরের বৌ হয়ে মেয়েমানুষের যোগ্য মর্যাদা নিয়ে আমাদের হিন্দু সমাজে বাস করবার অধিকার তার চিরদিনই আছে, তবে কেন ওঁরা মনগড়া কতকগুলো ধারণা নিয়ে গোঁড়ামীর বশে একটা নির্দোষ মেয়ের উপর এমন অবিচার করতে চাইছেন? আমি শুনতে চাই, তারা এরপরও মমতাকে তোমার স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিতে চান কিনা।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সুশান্তের প্রাণখোলা অট্টহাসির শব্দে সমস্ত ঘরখানা যেন গমগম করে উঠল। সে একটানা ভাবে হাসতে হাসতে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। যেন খুব চেষ্টা করে হাসি বন্ধ করে বলল, আগে হাতটা ধুয়ে আসি, তারপরে আপনার এই সাধু চেষ্টার পরিণামটা কতদূর কি হবে তা আমি এখানে বসেই বলে দেব। হাত ধুয়ে এল সুশান্ত। আর বলল, ঐ থালাটার ওপরেই হাতটা ধুয়ে নিন দাদা। আপনার আর ওঠবার দরকার নেই। এবার চা খেতে খেতে আমার বক্তব্যটা শুনুন।

মমতা আমার হাতে জল দিল। আমরা দুজনে চায়ে চুমুক দিলাম। সুশান্ত বলল, আপনার কথা শুনে এই মনে করে হেসে ফেলেছিলাম দাদা যে আপনার চেষ্টার আগেই আমার স্নেহশীল মামারা আজ চারপাঁচ মাস ধরে আকাশ পাতাল চেষ্টা করছেন যাতে মমতা নামে বিধর্মির ছোঁয়ায় দাগী নার্শমেয়েটাকে বিয়ে করে স্বধর্মের প্রতি আস্থাহীন তাঁদের অবাধ্য ভাগ্নেমহাশয় পাঁচজন আত্মীয়স্বজন আর চেনাজানা লোকের কাছে তাঁদের মুখ না ডোবায়। যে পবিত্র

অকলঙ্ক হিন্দুর ঘরে তাঁরা বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বোনের একমাত্র ছেলেটা মুসলমানদের দ্বারা নষ্ট একটা মেয়েকে বিয়ে করে সেই বংশকে কলঙ্কিত আর কলুষিত করবে। হিন্দুর ছেলে হয়ে, দু'বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক করে, ঠাকুরদেবতাকে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে, এ অশাস্ত্রীয় বিবাহ তারা কি করে চোখে দেখবেন? তাইত তারা যখন এই অকৃতজ্ঞ আর একরোখা ছেলেটাকে নানাভাবে বুঝিয়েসুজিয়েও এই অধর্মের কার্য থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না, তখন তাঁরা ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে নিজেরাই আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করে দিলেন।

আবার জোরে জোরে হাসতে লাগল সুশান্ত।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বলল, তাঁরা দু'ভায়ে মেডিকেল কলেজে আমার ওপরও'লাদের কাছে ধর্ণা দিলেন, আমার জন্যে সুন্দরী এবং সৎ পাত্রীর ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, তাও জানালেন। পাত্রীপক্ষেরা অনেক টাকা দেবেন, দামী মোটরগাড়ী দেবেন, এমন কি আমাকে সমস্ত খরচা দিয়ে বড় বড় ডিগ্রী লাভের জন্যে বিলেতজার্মান পাঠাবেন। অতএব ওঁরা যদি সুশান্তকে একটু বুঝিয়ে বলেন, যদি ওর গোবরভরা মগজে একটু সৎবুদ্ধি দেন, তাহলে হয়ত চালচুলোহীন মুসলমানদের ভাত খাওয়া ওই মেয়েটার মোহ ত্যাগ করে—বোকা ছেলেটা ওই রাজকন্যাটির গলায় মালা দিয়ে অর্ধেক রাজত্ব লাভ করবার সুবুদ্ধি ফিরে পাবে।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, ওঁরা ওদের দু'ভায়ের আর্জি শুনে কি বললেন?

সুশান্ত বলল; তাঁরা স্পষ্টভাবে জানালেন, এবিষয়ে সুশান্তকে পরামর্শ দেবার বা বোঝাবার তাঁদের কোন অধিকার নেই। সে যা বুঝবে তাই করবে। মামারা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলেন।

কিন্তু মমতাকে জব্দ করবার খানিকটা ফন্দি করে গেলেন। তাঁদের মুখের কথাগুলো অনেক মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মমতার ফেলে আসা জীবনটার কথা আবার নতুন করে কলেজের এর ওর কাছে একটা রসাল আলোচনা হয়ে উঠল। কেউ কেউ মমতাকে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করল।

তবুও মমতা নির্বিকার। মমতা তাদের সমস্ত ঘটনাগুলো জানিয়ে দিল। আমি মমতাকে পাঁচজনের কাছে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু মমতার ঐ এক কথা। যে কথাটা মমতা একটু আগে আপনার কাছে মাথা উঁচু করে বলেছে, —মিথ্যে দিয়ে সত্যকে সে ছোট করতে পারবে না।

এবার আমি বুঝতে পারলাম, কি ভাবে মমতার প্রথম জীবনের ঘটনাটা হাসপাতালের নার্শমহলে ছড়িয়ে পড়েছে, কি কারণে হাসপাতালে মমতার জীবনটা ঠাট্টা আর মুখরোচক কুৎসার নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছে।

আমি ভয়ে ভয়ে মমতার দিকে তাকালাম। আবার যদি মেয়েটার চোখে জল দেখি।

কিন্তু দেখলাম মমতা ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছে। আমি স্বস্তি বোধ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছ কেন মমতা?

মমতা বলল, মামারা দশবারদিন আগে এবাড়ীতে এসে আমাকে এখানথেকে উৎখাত করবার জন্যে বাড়ীর মালিকদের কাছে নতুন করে যে চেষ্টা করে গেছেন, সেটার কথা ভেবেই নিজের মনে হাসছি দাদা।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এ বাড়ীতেও এসেছিলেন ওঁরা?

মমতা উঠে এসে একটা ছোট্ট ডিসে চারটি সুপারি এলাচ নিয়ে আমাদের সামনে রেখে বলল, এ বাড়ীর গিন্নির মুখে তাইত

শুনলাম সেদিন। ওঁরা আমার সম্বন্ধে ঐ কথাই বলে গেছেন সেদিন। আরো বলে গেছেন, অমন মেয়েকে আপনাদের ঘরে ভাড়াটে করে রাখলে পরে আপনাদেরই ক্ষতি হতে পারে।

একটু থেমে মমতা আবার বলল, এঁরা নির্ঝঞ্ঝাটে মাসে মাসে মোটা টাকা পান বলে দোতলার চারখানা ঘর মেয়েদেরই ভাড়া দিয়েছেন। কেউ অফিসে চাকরী করে, কেউ নার্শের কাজ করে, কেউ বা কলেজে পড়ে। তু'তিন জনে মিলে এক একটা ঘরে থাকি। থাকবারও সুবিধে, ভাড়া হিসেবে পয়সা কম দেবারও সুবিধে।

আমি বললাম, তার মানে এরপর কম পয়সা ভাড়া দিয়ে এবাড়ীতে আর তোমার অন্য মেয়েদের সঙ্গে থাকা চলেবে না। কারণ তোমার জীবনের পরিচয় অন্য মেয়েরা জানতে পারলে তোমার সঙ্গে আর এক বাড়ীতে এক ঘরে থাকতে রাজী হবে না। ফলে একটা মেয়ের জন্যে পাঁচটা ভাড়াটেকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে বাড়ীর কর্তা বা গিন্নীর ভাড়া হিসেবে মোটা টাকার তোড়া মাসে মাসে হাতে আসবে না।

মমতা শান্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক তাই হয়েছে। চার-পাঁচ দিন আগে আমি নীচের কলতলায় জল আনতে গিছিলাম। বাড়ীর গিন্নী কলে গা ধুচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বড় বড় চোখ করে আঁৎকে উঠে বললেন, এদিকে এসো না বাছা, না না, এদিকে এসো না। তুমি বাপু আর এ কলটা ছুঁয়ো না। কোথাকার কারা এসে কাল তোমার নামে কর্ত্তাকে কিসব বলে গেছে। তুমি নাকি মুসলমানদের ঘরে ছিলে, ওদের হাতের রান্না ভাত খেয়েছিলে। তাহলে তোমার ত বাপু জাতধর্ম্ম সব নষ্ট হয়ে গেছে। উনি'ত বলছেন, তুমি যত শিগগীর পার এ বাড়ী থেকে উঠে

যাও। আর সব ভাড়াটেরা তোমার কথা শুনে বড় রাগারাগি করছে। তোমার জন্যে একতলা দোতলার এতগুলো ভাড়াটেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ত' আর খাওয়াপরা বন্ধ করতে পারি না। আর দেখ, যে কটাদিন এখানে থাকবে, কলটা ছোঁবে না। কাউকে না হয় বলবে; তোমাকে জল তুলে ঢেলে দেবে। বুঝেছ ?

এক নাগাড়ে কথাগুলো শেষ করে মমতা একটু হেসে আবার বলল, ওনার সব কথাই আমি বুঝেছি দাদা। বুঝেছি, আমার ঘরে আমার সঙ্গে ঐ যে মেয়েটি থাকত, ও হঠাৎ চলে যাওয়াতেই কর্তাগিন্নী দু'জনেই ওঁদের ভাড়ার ভবিষ্যৎটা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠেছেন। মাসে মাসে সাতআটখানা ঘরের ভাড়াটে মেয়েদের কাছথেকে মোটা টাকা হারাবার দুর্ভাবনায় আমাকে কলতলাতেই মুখে মুখে উচ্ছেদের নোটিশটা শুনিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমান-দের গন্ধলাগা ঐ মেয়েটা যাতে ঐ লোহার কলের জলটা ছুঁয়ে জলটাকে শুদ্ধু অপবিত্র করে দিয়ে না যায়, সেজন্য সাবধান করে দিয়েছেন।

হঠাৎ সুশান্ত চড়াগলায় বলে উঠল, মমতা, এর মধ্যে ওরা তোমাকে এ বাড়ী ছাড়তে বলেছেন, কৈ, একথা তুমি ত আমাকে কিছু জানাও নি!

মমতা তখনো হাসছিল। হাসতে হাসতেই সে বলল, জানাবার কি এমন আছে? একথা আজ না হয় কাল ওরা বলবেই, এ তো তুমি আগেই জানতে।

ভরসা দেবার মত স্বর করে সুশান্ত বলল, বলুক ওরা, এর জন্যে তুমি চিন্তা কোর না। আমি দু'একদিনের মধ্যে অন্য বাড়ী খোঁজ করে দেব।

আমি এবার ওদের দু'জনের দুর্ভাবনাটা হালকা করে দেবার জন্যে ঠাট্টার স্বরে বললাম, আর অন্য ঘর খুঁজবে কেন ভাই সুশান্ত, এবার আমার এই বোনটাকে একেবারে নিজের ঘরে নিজের চিরদিনের আপনজন করে নিয়ে তোল। ঘর খোঁজাখুঁজির সমাধান হয়ে যাবে।

আমার কথা শুনে সুশান্ত অস্থিরভাবে বলে ফেলল, আমি ত তাই চাই দাদা। আপনাকে সবই যখন জানিয়েছি, তখন আপনার কাছে আর আমাদের লজ্জা কি? আমি এখনো বলছি দাদা, আমার মামারা এ বিয়েতে রাজী ত ননই, উল্টে তারা প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছেন যাতে এই মেয়েটা পর্যন্ত স্থির হয়ে এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে। কিন্তু মাত্র একবছর আগে যখন তাঁদের এই আদরের ভাগ্নের বেশ শক্ত একটা রোগ ধরেছিল, আর স্নেহকাতর মামামামীর দল যখন গেরস্থ বাড়ীতে এ রোগের শুশ্রূষা করা অসম্ভব মনে করে তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে সরিয়ে দিয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন, যাক. ছোঁয়ালেপার ভয় থেকে বাঁচা গেল। কি জানি কি হয়, ওর বাবাও ত এই রক্ত ওঠা রোগে ভুগে মরেছে। এ বাড়ীতে পাঁচ জনের মাঝখানে পড়ে পড়ে ভুগলে আর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোলে আবার যদি কারো ছোঁয়াচ লেগে যায়। তারচেয়ে হাসপাতালে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভালই হয়েছে। হয় ওইখানেই মরবে, না হয় ওইখানেই আমাদের ছোঁয়ালেপার বাইরে থেকে একেবারে সরে যাবে। কিন্তু কি জানেন দাদা, তখন মুসলমানের ঘরে আশ্রয় পাওয়া এই নার্শ মেয়েটাই তার নাওয়াখাওয়া বন্ধ করে দিনরাত আমার বিছানার পাশে বসেছিল, ডাক্তারদের ব্যবস্থা মত ওষুধ আর পথ্যি খাইয়ে

দিয়েছিল, আমার মুখের রক্তের ছোপগুলো নিজের আঁচল দিয়ে মুছে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারতাম, আমি চোখ বুজে থাকলে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়ে দিয়েছিল। অথচ আমাদের দু'জনের কাজের মেলামেশার ভেতর দিয়েই তখন আমাদের সবে পাঁচ ছ'মাস জানাশোনা আর আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তখন আমারও মমতার ওপর কোন জোর ছিল না কিংবা মমতারও আমার জন্যে কোন দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। শুধু কথায় কথায় আমি জেনেছিলাম, মমতার দুঃখের জীবনের কথা আর আমিও মমতাকে আমার মনের সমস্ত ভার উজাড় করে দিয়ে জানিয়েছিলাম আমার মা বাবার কথা, আমার হতভাগী বোনটার কথা, আমার নিজের ছন্নছাড়া নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

একবার থামল সুশান্ত। তারপরেই আবার যেন একটু উত্তেজিত স্বরেই বলল, এই মমতাই তখন এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র আপনার জন হয়েছিল। মনে হয়, তার নিজের জীবনের কথাগুলো একটার পর একটা বলে এই সন্থ পাশকরা ডাক্তার বাবু মমতাকে তার কাছে টেনেছিল কিম্বা মমতা নিজের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধু সুশান্তের জীবনের এক জায়গায় একটা আশ্চর্য মিল দেখে নিজের ইচ্ছেয় তার কাছে এসেছিল, তার প্রাণপণ শুশ্রূষা দিয়ে আর মনের জোর দিয়ে আমাকে রোগের কবল থেকে একেবারে মুক্ত করেছিল।

তারপর আমি ভাল হয়ে গেলাম, আবার মামাদের বাড়ীতে ফিরে এলাম। কিন্তু আমার তখন মনে হতে লাগল, এ বাড়ী আমার নয়, বরং ঐ মমতা বলে অনাথা মেয়েটা যেখানে থাকে সেই বাড়ীটাই আমার বাড়ী।

তারপর একদিন মমতাকে সাহস করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম,

প্রায় ছ'সাতটা মাস তুমি আমাকে শুশ্রূষা করেছ মমতা, আমার পাশে সারারাত জেগে বসে থেকে আবার দিনের বেলা হাসপাতালের ডিউটি করেছ, নিজের সামান্য রোজগারের পয়সা থেকে আমার জন্যে কত খাবার কিনে এনেছে। তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ মমতা। তাই বলছি কি, তোমার এই সেবার বদলে আমিও আমার সামান্য সাধ্য অনুসারে তোমাকে কিছু দেবার সাধ করেছি মমতা।

কিন্তু আমার দুঃখটা কোথায় জানেন দাদা ? সুশান্তের একটু আগের চড়াপর্দায় উঠে যাওয়া আওয়াজটা সঙ্গে সঙ্গে আবার কেমন যেন একটা কোমল করুণ স্বরে নেমে এলো,… দুঃখটা এই, সেদিনও আমার ঐ কথাটা শুনে মমতা যেমন মাথা নেড়ে অস্বীকার জানিয়ে সেখান থেকে চলে গিছিল, ঐ দেখুন, ঠিক আজও তেমনি করে আপনার বোন মমতা আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে শুনবেন দাদা ?

আমি দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, মমতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মমতা তাড়াতাড়ি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বলল, আমার পক্ষে কতকগুলো কড়া কড়া সর্ত পালন করবার দাবী টেনে এনে তবে মমতা আমার সাধ পূর্ণ করতে চায়। কিন্তু ওর দাবী মত সর্তগুলো পালন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব আর অসাধ্য। তাই কথাটা পাড়লেই বারবার অমনি করে হেসে অস্বীকার জানিয়ে চলে যায়।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, মমতার ঐ সর্তগুলো কি কি সুশান্ত ?

উদাস স্বরে সুশান্ত জবাব দিল, আমার যারা আপনার লোক তারাই উদ্যোগী হয়ে মমতার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তাদের সকলের মাঝখানে সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমি মমতার গলায় মালা দেব, আমার আর মমতার গুরুজনস্থানীয় কেউ অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে এই বিয়ের আয়োজন করবে।

আমি বলে উঠলাম, অর্থাৎ মমতা চায়, মমতা যে হিন্দুর মেয়ে আর হিন্দুর ঘরের বউ একথা যদি আমাদের হিন্দু সমাজ স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নিতে রাজী থাকে, তবেই সে সুশান্ত ডাক্তারকে বিয়ে করতে পারে। এইত ?

সুশান্ত আস্তে আস্তে বলল, ঠিক তাই। কিন্তু এ যে আমার পক্ষে অসম্ভব দাদা। শুনেছেন ত, মামারা এ বিয়ে বন্ধ করার জন্যে কি রকম অস্থির হয়ে পড়েছেন, মমতাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁরা আবার কিনা সেই ধর্মে পতিত মেয়েটাকে ভাগ্নের বৌ বলে স্বীকার করবেন কিম্বা তার হাতের রান্না খাবেন ?

আমার মনে হয়, শুধু মামামামীরা নয়, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব পর্যন্ত এ বিয়েতে আসবে না। মুখে বড় বড় কথা বলে উদারতা অনেকেই দেখাতে চায় কিন্তু মনে মনে ধর্ম আর জাতি-ভেদের সংস্কারটা পুষে রেখে মানুষকে নিজের ঘর সংসারে সাহস করে আপন বলে মেনে নিতে পারে না। নিজের মনের তলার চাপা অন্ধবিশ্বাসটাকে "লোকে কি বলবে" এই অজুহাত দেখিয়ে নিজেই বজায় রাখতে চায়।

তাইত বলছি দাদা, আপনার বোন মমতার এই সর্তগুলো পালন করা সুশান্তডাক্তারের মত একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন সামান্য মানুষের পক্ষে এদেশে অসম্ভব।

সুশান্তের এই দুঃখটার খানিকটা আমি বুঝতে পারলাম। তবে সুশান্ত ঠিক কথাই বলেছে। যে অধিকার নিয়ে মমতা সুশান্তকে বিয়ে করতে চায়, সে অধিকার সুশান্ত ত দূরের কথা, এই ভারতবর্ষের কোন মানুষ, এমন কি কোন মানুষের সমষ্টিও মমতাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এমন ছোট বড় অনেক সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠান জেগেছে, তারা হিন্দুধর্মের উদারতার আর সমন্বয়ের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে মধ্যে মধ্যে লোকদেখান অনুষ্ঠান আর আড়ম্বর করে আমাদের ছোট জাতের মানুষকে শুদ্ধি করে দেশের নাম করা আর হোমরাচোমরা মহাত্মাদের সঙ্গে পঙক্তি ভোজন করে, কিম্বা সময়ে সময়ে মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি অন্য ধর্মের কতকগুলো লোককে যাগযজ্ঞে আর বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করে হিন্দু-ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করেছে বলে প্রচার করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু প্রচার আর আড়ম্বরের ঢাকের বাজনাটা থেমে গেলেই আবার সব চুপচাপ। শুদ্ধিকরা মানুষগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে যায়, সারা ভারতে ঘুমন্ত প্রকাণ্ড অজগরের মত হিন্দু-সমাজের মনটা আবার আসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কোটি কোটি মানুষগুলো নিজের নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজের জাত, ধর্ম, বংশ, কুল এবং শ্রেণীর অখণ্ড পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যে সতর্ক থাকে। ট্রেনে, বাসে, মোটরে নানা-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যাতায়াত করে, সিনেমা থিয়েটারে মেলায় বিভিন্নজাতের সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁসে ওঠাবসা করে, এমনকি চায়ের দোকানে, হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে বা রুজিরোজগারের জায়গায় পাশপাশি বসে খাওয়াদাওয়া করে কিন্তু যেই নিজের সংসারে নিজের পরিবারের মধ্যে ফিরে আসে, তৎক্ষণাৎ নিজের পবিত্র

হিন্দুধর্মের আর বংশের অভিমানটাও তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। তখন বাড়ীর মধ্যে, পাড়ার বা জানাশোনা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নিজেকে খাঁটি নির্ভেজাল সনাতন ধর্মের মানুষ বলে বুঝিয়ে দেয়, তখন হিন্দুর ছেলে বা মেয়ে ধর্মকর্ম, পূজা-পার্বণ, বিয়ে-পৈতে এই সব ক্রিয়াকলাপের সময় অন্যধর্মের মানুষত ভাবনার বাইরের কথা, হিন্দুধর্মেরই নীচু শ্রেণীর অস্পৃশ্য মানুষগুলো পাছে তাদের কাছে এসে তাদের ছুঁয়ে দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করে দেয়, এই ভেবে সতর্ক থাকে আর নিজের সমান শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, স্বজাতের অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন করে নিজের জাতের গণ্ডীটাকে অটুট রেখেছে ভেবে পরম সান্ত্বনা লাভ করে। শুধু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কেন, উঁচু মাঝারি নীচু সব শ্রেণীই নিজের ধর্মীয় আর সামাজিক কাজকর্মে এই ভাবে নিজের জাত আর হিন্দুত্ব রক্ষা করে। যারা নিজের ধর্মের মানুষকে ছোটজাত বলে ঘেন্না করে নিজের সমাজের ভেতরে নেয় না, তারা কি সাহসে মমতাদের মত বিধর্মী মুসলমানদের অন্ন-ভোজনকারী ধর্মচ্যুতা মেয়েদের নিজের সমাজে আর সংসারে ঢুকতে দিয়ে নিজের ধর্মটাকে কলুষিত করবে?

তবু যদি বা কোন দুঃসাহসী-মানুষ এমন অধর্মের কাজ করবার স্পর্ধা করে, তখন ওরা ঐ পতিতা মেয়েটার সঙ্গে তাকেও তাড়িয়ে দেয়, তাকে পর্যন্ত হিন্দুত্বের পবিত্র গণ্ডীথেকে বাইরে সরিয়ে দেয়। মমতাকে হিন্দুসমাজের আওতা থেকে বার করে দিয়েছে সুশান্তের মামারা, মমতার সঙ্গে একই ঘরে ভাড়া থাকা ঐ চাকুরে মেয়েটা, মমতার বাড়ীও'লারা, এমনকি মেডিকেল কলেজের তার ঐ নার্শ সহকর্মীর দল পর্যন্ত। একা এই সুশান্তের

সাধ্য কি ঐ "বাঘে ছোঁয়া" মেয়েটাকে হিন্দুর মেয়ে বলে নিজের ঘরে এনে রক্ষে করে ?

এক্ষেত্রে আমি সুশান্তকে কি সান্ত্বনা বা ভরসা দিতে পারি ?

একসময় সুশান্তের কথায় আমার চিন্তাগুলো ভেঙ্গে যায়। সুশান্ত বলল, আমি মমতাকে অনেক করে বুঝিয়েছি দাদা, চল মমতা, এখানকার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের বিয়ে স্বীকার করে নাই বা নিল, তাতে তোমার আমার জীবনে কিছুই আসবে যাবে না। চল, আমরা এখান থেকে, এদেশ থেকে চলে যাই। আমি দূরদেশে কোথাও চাকরী নেব, সেখানে তোমাতে আমাতে থাকব। সেখানে তোমার আমার শান্তির জীবনে বাধা দেবার কেউ আসবে না।

কিন্তু মমতা এ কথাতেও রাজী নয়।

আমি এবার ছোট্ট করে বললাম, কেন ?

সুশান্ত বলল, মমতা বলে, নিজেদের তৃপ্তির জন্যে পালিয়ে গিয়ে দেশছাড়া, আত্মীয় বান্ধব আর সমাজছাড়া হয়ে আমি বাস করতে পারব না। তবু আমি ওকে বলেছিলাম, সেদেশে এদেশের সমাজ নাই বা রইল, অন্য মানুষেরাও সেখানে থাকে, আমরা তাদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের সমাজে বাস করব।

আমি কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইলাম, তোমার এ কথার উত্তরে কি বলেছে মমতা ?

সুশান্ত কেমন যেন হতাশার স্বরে বলল, মমতা বলে, তোমার শান্তির জন্যে আমি সব কিছুই করতে পারি কিন্তু তাই বলে নিজে সজ্ঞানে বা স্বইচ্ছায় কোন অন্যায় না করেও কেবল তোমাকে পাব বলে নিজের দেশ আর দেশের মানুষগুলোকে এড়িয়ে বাইরে চলে গিয়ে ওদের চোখে ভীরু আর পলাতক হয়ে থাকতে পারব না

কিছুতে। আমি এদেশের মেয়ে যখন, তখন এদেশেই বাস করতে চাই। আমি হিন্দু, তাই হিন্দুর মেয়ের সমস্ত অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই। পারত, হিন্দুর মেয়ে হিসেবে বাঁচাও আমাকে।

চুপ করল সুশান্ত।

আমিও মুখে কোন কথা বলতে পারলাম না, তবু আমার মনের ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করতে লাগল। মমতার ঐ শেষ কথাটুকু যেন তার সদম্ভ দাবী নয়, কিম্বা তার অভিমানে ভরা ক্ষুব্ধ মনের কঠোর সর্ত নয়, বরং মনে হল, তার ঐ কথাটুকু দিয়ে মেয়েটা কাতর মিনতি জানাচ্ছে, মেয়েটা হিন্দুর মেয়ে হয়ে, হিন্দুর বউ হয়ে, হিন্দু সমাজের একজন মানুষ হয়ে হিন্দুর বাড়ীতে আশ্রয় পাবার জন্যে আকুল স্বরে আবেদন জানাচ্ছে। আবেদন জানাচ্ছে শুধু সুশান্তের কাছে নয়, আবেদন জানাচ্ছে, এ দেশের গোটা হিন্দু সমাজের কাছে, বিনাদোষে পতিত এবং পরিত্যক্ত একটা মেয়েকে আবার তার নিজের ঘরে আশ্রয় দেবার জন্যে, আবেদন জানাচ্ছে এই সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু সমাজের সত্যিকারের মানুষের মত মানুষগুলোর কাছে। সে জীবনের সমস্ত আকাঙ্খা নিয়ে তাই যেন বলছে, পারত, হিন্দুর মেয়ে হিসেবে বাঁচাও আমাকে!

ভাবতে ভাবতে আমার মনে হল, ওর ঐ কাতর আবেদনের ভেতর থেকে আরও কত মেয়ের গলার আকুল স্বর আমি যেন শুনতে পাচ্ছি। হাজার বছর আগে যখন প্রথম মুসলমান পা দিল ভারতবর্ষের মাটিতে, সেইদিন থেকে কত মেয়ে চীৎকার করেছে। অপহৃতা, ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা হয়েও আবার নিজের সমাজের মানুষগুলোর কাছে ফিরে আসতে চেয়েছে, বলেছে, দোষ ত আমার নয়, তবে কেন আমাকে বিনাদোষে এমন করে তোমাদের ধর্ম থেকে, তোমাদের সমাজ থেকে ফেলে দেবে, কেন আমাকে আপন ঘরের

অধিকার থেকে তাড়িয়ে দেবে? না, না, তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে আবার আমাকে বাঁচাও গো।

তারপর মুসলমানরা যত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের চারিদিকে, চারিদিক থেকে তত বেশী মেয়ের কান্না আর বাঁচবার জন্য আকুল আর্তস্বরও ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এদিকে ওদিকে, এগ্রামে ওগ্রামে, এপ্রান্তে ওপ্রান্তে সারাটা দেশ জুড়ে মুসলমানের এঁটোলাগা হাজার হাজার হিন্দুর মেয়ের বাঁচবার জন্যে আকুল কান্না!

ঠিক ঐ রকম কান্নার স্বর, বাঁচবার জন্যে ঐ রকম আকুল আবেদনের স্বর আমিও সেদিন শুনেছিলাম রাস্তার ফুটপাতের উপর জীবনের লাঞ্ছনার ইতিহাস মেলে ধরা ধর্মান্তরিতা মুসলমানী মেয়ে ফতিমার মুখে। ধর্মান্তরিতা হয়েও ফতিমা আবার প্রতিমা হতে চেয়েছিল, পাকিস্তান থেকে কলকাতায় বড় আশা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিল, এত বড় সহরের হিন্দুর দরজায় দরজায় আকুল ভাবে হাত বাড়িয়েছিল,···আমাকে তোমাদের মধ্যে আশ্রয় দাও, তোমাদের সঙ্গে হিন্দুর মেয়ে হয়ে থাকতে দাও, আমাকে আবার প্রতিমা হয়ে বাঁচতে দাও, আমাকে তোমরা বাঁচাও, বাঁচাও প্রতিমাকে!

দাদা!

হঠাৎ ডাকটা শুনে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠি!

কে···প্রতিমা?

আমি, দাদা, আমি মমতা!···

খিলখিল করে হেসে ওঠে মমতা। হাসতে হাসতে বলল, ছু'জনে বসে বসে কার কথা ভাবছিলেন দাদা? প্রতিমা আবার

কোথায় ? মমতাই ত এখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দুঃস্বপ্নের ঘোরটা কেটে গেল। গাটা একটু ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবে বললাম, তুমি এরমধ্যে কোথায় গিছিলে মমতা ?

মমতা মুখখানা নিচু করে শান্তস্বরে বলল, আপনারা দু'জনে কথাবার্তা বলছেন শুনে সেই ফাঁকে আমি বাড়ীওয়ালী মার ঘরে গিছিলাম। ওঁকে জানিয়ে এলাম, আর ত চার পাঁচটা দিন পরে এ মাসটা চলে যাচ্ছে। তাই মাস কাবার হলে আমিও এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। আমার জন্যে ওঁদের আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

খবরটা জানিয়েই মমতা আবার ঘরের কাজে হাত দিল। এঁটো বাসনকোসনগুলো তুলে বাইরের বারান্দায় রেখে এল। ভিজে ন্যাতা দিয়ে বারান্দাটা বেশ করে মুছে ফেলল। ষ্টোভটা ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করে ঘরের এক কোণে সরিয়ে রাখল।

আমার মনটা তখনো কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ছিল। তবু আমি জোর দিয়ে বলে ফেললাম, একি, তুমি খেলে না মমতা ?

কাজ করতে করতে মমতা ঘাড় ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, না দাদা। সবইত করা রইল। একটু পরে খাব। বাসনকোসনগুলো ধুয়ে আনি ততক্ষণ। আর একটু বসুন আপনারা।

মমতা আবার বাইরে চলে গেল।

সুশান্ত এতক্ষণ চুপ করে মমতার কাজগুলো দেখছিল। মমতা বাইরে গেলে সুশান্ত কথা বলল, মমতা সকাল সন্ধ্যেয় ওর আশ্রমের গুরুদেবের কথামত ঠাকুরকে প্রণাম না করে কিছু খায় না। হাসপাতালেও দেখেছি, কাজ করতে করতে সকাল হয়ে

গেলে বা সন্ধ্যে হয়ে গেলে বাড়ীতে না ফেরা অবধি মুখে জলটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করে না।

আমি সুশান্তের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সুশান্তও আমার দিকে তাকিয়ে গলার স্বরটা শুখনো করে বলল, আশ্চর্য ওর ঠাকুর দেবতার ওপর ভক্তি। কিন্তু কৈ, আমাদের ঠাকুর তবু ওকে হিন্দুর মেয়ে বলে রক্ষে করছেন না ত ?

শুখনো স্বরে একটু হাসল সুশান্ত।

আমি হাসতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, জোর করে টেনে আনা ঐ হাসিটুকুর পেছনে সুশান্ত জ্বালাজর্জরিত মস্তবড় একটা ব্যঙ্গকে আড়াল করে রাখতে চাইছে।

একটু পরেই বাসনগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল মমতা। বাসন-কোসনগুলো ঘরের তাকের ওপর রেখে শাড়ীর আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে হাসিমুখে বলল, এবার কি গল্পসল্প করবেন, করুন দাদা। আমার হাতের কাজ সেরে ফেলেছি!

এরমধ্যে আমি মনেমনে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছিলাম, তাই তার কথার সঙ্গে সঙ্গে চটপট বলে উঠলাম, গল্প এবার করব মমতা। তবে খুব ছোট্ট একটা গল্প। কিন্তু তার আগে আমারও একটা কড়া সর্ত আছে শুনে রাখ। সর্তটা হল, গল্পটাকে শেষ করতে হলে তোমাকেও আমার গল্পটার শেষে খুব স্পষ্ট করে শুধু একটা কথা বলতে হবে। তুমি শুধু বলবে,—হ্যাঁ।

আমার কথা শুনে মমতা যেন হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাসতে হাসতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। তারপরে বলল, ও বাবা, এ কি রকম গল্প বলার সর্ত দাদা। এ যেন সেই রাস্তায় ভীড় জমিয়ে যারা ম্যাজিক দেখায়, ঠিক তাদের মত হেঁয়ালী,…ওরা ম্যাজিক দেখাবার আগে বলে,

একবার হাততালি দিয়ে বল ভাইসব,—হ্যাঁ !! ব্যস, অমনি দর্শকেরা চেঁচিয়ে ওঠে একসঙ্গে···

আমি মমতাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম না। মমতার কথাটা ফুরোবার আগেই নিজেই চেঁচিয়ে উঠলাম.···হ্যাঁ !!

তারপর হো হো করে খুব একচোট হেসে নিলাম। সুশান্ত আর মমতাও আমার সঙ্গে গলাছেড়ে হাসতে লাগল।

সমস্ত ঘরখানা হাসির তরঙ্গে টলমল করতে লাগল। মনে হল, খানিকটা আগের দুঃখের গুমোট গরমটা যেন ঘর থেকে একেবারে ভেসে বেরিয়ে গেল।

হালকা আবহাওয়ায় মনটাকে এবার বেশ হালকা করে খোশ-মেজাজে বললাম. আর হাসি নয় ভাই। ঠিক ঐ ম্যাজিকওলাদের মত আমি গল্প শেষ করে বলব, বল, হ্যাঁ। আর তুমিও অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলবে—"হ্যাঁ"।

কেমন ? রাজী থাকত, তবে বলি গল্পটা ?

উজ্জ্বল চোখ তুলে তাকাল মমতা আমার দিকে। তাকাল সুশান্তের দিকে।

সুশান্ত হাসতে হাসতেই বলে উঠল, সত্যি মমতা, তুমি বিশ্বাস কর, দাদা কি বলবে আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানি না। তবে এরকম অদ্ভুত সর্তজোড়া গল্প শুনতে আমারও বড় লোভ হচ্ছে। মমতা আবার আমার দিকে তাকাল। হাসিমুখে বলল, বেশ, আমি আপনার সর্তে রাজী আছি। এবার বলুন আপনার গল্প।

আমি ঘরের ওপরের কড়িগুলোর দিকে একবার তাকালাম, চোখদুটো বুজে একটু ভাবলাম, গলাটা শব্দ করে খানিকটা ঝেড়ে নিলাম, তারপরে স্থিরভাবে বললাম,—এখন থেকে দশ এগার বছর আগে এই কোলকাতা সহরের একটা রাস্তায় ছোট্ট একটা দোতলা

বাড়ীতে এক মা আর তার আঠার বছরের এক ছেলে আর তার দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ বিধবা হয়েছিল। কিন্তু মা তার ছেলেকে আর মেয়েকে সবসময়ে তার পাশে পাশে আছে দেখে তার সমস্ত কষ্ট আর দুঃখ আস্তে আস্তে ভুলে গিছিল। ছেলেটা আর মেয়েটা তার দুটো চোখের উজ্জ্বল মণির মত তার সামনে ঘুরেফিরে, ছুটোছুটি করে, খেলাধুলা আর হাসিহল্লা করে তার দৃষ্টি থেকে শোকের অন্ধকারটাকে একেবারে দূর করে দিয়েছিল।

তারপরে কেটে গেল, একবছর, দু'বছর, তিনবছর, চারবছর, পাঁচবছর···

সেদিনের আঠের বছরের ভাইটার বয়েস হল বাইশ. দশবছরের বোনটার বয়েস হল পনের।

বাইশবছরের ভাই একদিন ছুটতে ছুটতে বাড়ী ঢুকল, মার পায়ের উপর মাথাটা টিপ করে ঠেকিয়ে একটা নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল আর হাসতে হাসতে বলল, মা, মাগো, তোমার সাধ পূর্ণ হয়েছে, আমি এম, এ, পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করেছি!

ভাইটার কথা শেষ হতে না হতেই পনের বছরের মেয়েটা সদর দরজা ঠেলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকল, ঝড়ের মত বেগে দৌড়ে এসে দু'হাতে মার কোমরটা জড়িয়ে ধরে কলকলিয়ে উঠল, মা, মামণি, তোমার কল্পনা সত্যি হয়েছে, আমি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছি!

বোন এসে মাকে দখল করেছে দেখে ভাইটা হিংসায় জ্বলে গেল, বোনের দিকে জিভ দিয়ে ভেংচি কেটে বলল, খুব কেরামতি করেছ। পাশের ছাপ নিয়ে বিয়ের বাজারে দাম বাড়িয়েছ। আর তার ফলে মার চোখ থেকে ঘুমটাকে তাড়িয়ে দেবার যোগাড় করেছ।

বোনও ছেড়ে দেবার মেয়ে নয়। সে ভাইএর দিকে মুখ

ফিরিয়ে পালটা ভেংচি কেটে বলল, খুব বাহাদুরী করেছ। এতদিন পড়বার দোহাই দিয়ে ঘরের পয়সা নষ্ট করে কলেজের রেষ্টুরেন্টে বসে বন্ধুদের নিয়ে চপকাটলেট গিলেছ কিম্বা সিনেমাপাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছ। এবার থেকে দিস্তে দিস্তে কাগজ কিনে অফিসে অফিসে চাকরীর দরখাস্ত পাঠাবার ভাঁওতা দিয়ে মার ক্যাসবাক্স খালি করে দেবার মতলব করেছ।

ভাইটা রাগের ভান করে বলে উঠল, দেখছ মা, মুখপুড়ী কি সব বলছে ?

বোনটা কপট মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠল, শুনছ মা, দাদা কি রকম গাল দিচ্ছে ?

মা তাঁর দু'হাত বাড়িয়ে ভাইবোন দু'জনকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। সেইসঙ্গে খুশীভরা গলায় বললেন, দাদারও বড় চাকরীবাকরী হবে আর তার বোনেরও বড় ঘরে বিয়ে হবে। তখন বোনও ইচ্ছে করলেই দাদার কাছে আসতে পারবে না কিম্বা দাদাও ইচ্ছে করলেই বোনের সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ পাবে না। সেদিন বোনও দাদার জন্যে ভাববে আর দাদাও বোনের জন্যে ছটফট করবে। সেইসব দিনের কথা মনে করে আজকের এমন আনন্দের দিনে ভাইবোনের ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেল !

মার স্বরে হাসি ঝরে।

ভাইবোনের কপট রেষারেষি মন থেকে ঝরে পড়ে। দু'জনে মার সামনে নিজের নিজের ডান হাতখানা দিয়ে বলে, যদি ভাই-বোনে আপোষ চাও, তবে দু'জনকে সন্দেশ খাওয়াও।

দু'জনেই খলখল করে হাসে।

পাঁচবছর পরে মার মনে তৃপ্তির আলো জাগে।

কিন্তু সেই আলোটা মাত্র দু'ট দিন যেতে না যেতেই হঠাৎ একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার নিষ্ঠুর ঝাপটায় ঝপ্ করে নিভে গেল।

ভাইবোন পাশ করেছে বলে মা আনন্দে অধীর হয়ে তার পরদিন সকালবেলা গঙ্গাতীরের কালীমন্দিরে আর বুড়ো শিব-তলায় মানতের পূজো দিতে গেলেন। মন্দিরের পাশেই ছিল চান করবার সিঁড়িবাঁধান ঘাট। মা আর মেয়ে চান করে পূজো দেবার জন্যে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলে নামলেন।

মা সবে চান করে জল থেকে ওপরে উঠে এসেছেন, মেয়ে তখনো জলে ডুব দিচ্ছে; এমন সময় ঘাটের চার পাশ থেকে অনেক মানুষের ভয়মাখান এলোমেলো চীৎকার ছড়িয়ে পড়ল, ওরে বান এসে পড়েছে, বান এসে গেছে, শিগ্গীর জল থেকে উঠে আয়, উঠে আয়, পালিয়ে আয়!

অনেক কণ্ঠের জটপাকান গোলমাল শুনে মা ব্যস্তসমস্ত ভাবে জলের দিকে ঘুরে তাকালেন।

কৈ, আর যারা জলে ছিল তারা সবাইত হুড়্দাড় করে ওপরে উঠে এল।

কিন্তু তাঁর মেয়েটা কই?

হঠাৎ যেন দু'চারজন আপশোষের স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, গেল, ঐ গেল, কাদের মেয়েটাগো, ঢেউএর ঝাপটায় একেবারে অগাধ জলে ভেসে গেল। হায়, হায়, হায়।

মা একটা বিকট আর্তস্বর কন্ঠে ডুকরে উঠলেন, খুকী, খুকী, আমার খুকী কোথায় গেলগো! এইত মেয়েটা ওখানে ঐ জলে দাঁড়িয়ে চান করছিল। ওযে সাঁতার জানে নাগো! ওরে আমার খুকীরে! আমার কি সব্বোনাশ হলরে!...পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে হতভাগী মা জলের দিকে ছুটে নেমে গেল।

বানের ঢেউগুলোও যেন সঙ্গে সঙ্গে সাদা সাদা অসংখ্য হিংস্র ফণাতুলে গর্জন করতে করতে ওপরের দিকে এগিয়ে এল।

চার পাঁচজন তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে মাকে ধরে ফেলল। টানতে টানতে ওপরে তুলে নিয়ে এল।

কারা যেন বলল, সাঁতার জানে না, তবে বানের সময় না জেনে জলে নামে কেন?

কে যেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, পাঁজিপুথি দেখে ক'টা মানুষ আর সাবধান হয়ে চান করতে আসে? তাইত যারা অসতর্ক, তাদের এই দশা ঘটে।

ছেলেটা ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিল।

এমন সময় পাড়ার দু'চার জন লোক ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে খবরটা জানাল। সে হন্তদন্ত হয়ে গঙ্গার ঘাটে ছুটে গেল।

গিয়ে দেখল, মা ঘাটের চাতালে শুয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর কাঁদতে কাঁদতে কেবল বলছেন, ফিরিয়ে দে মা, ফিরিয়ে দে, আমার মেয়েকে খেয়ে ফেলিস নি তুই, ফিরিয়ে দে রাক্ষুসী!

ছেলেটা মা'র দশা দেখল, উদাস দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

ঢেউ ঢেউ আর কেবল ঢেউ।

একটার পর একটা আসছে, একটার ওপর আর একটা আছড়ে পড়ছে! ওরা কি সত্যি সত্যি গর্জন করছে, না একটা মানুষের মেয়েকে এতগুলো লোকের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে বলে আনন্দে মাতামাতি করছে?

একপা একপা করে এগিয়ে যায় ছেলেটা। মানুষের জটলা ওকে জট পাকিয়ে ধরে। একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আমরা

এরমধ্যে পোর্টকমিশনরের অফিসে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি মশাই। ভেবে আর কি করবেন বলুন? ওদের জলপুলিশ জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ নিয়ে গিয়ে খোঁজ করবে। জোয়ার কমে গেলে হয়ত কোন চড়াটড়ায় আটকে আছে দেখতে পাবে।

কিন্তু পুলিশের লোক মেয়েটাকে দেখতে পেল না।

দু দু'টো দিন এধারে ওধারে, এ পারে ওপারে খোঁজাখুঁজি করে তারা রিপোর্ট দিল, লাশ পাওয়া গেল না। দুঃখের মধ্যেও ভাইটা আশ্চর্য হয়ে গেল।

গেল কোথায় তবে?

সে নিজে ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলে গেল। কত নৌকার মাঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কত মাছধরা জেলেকে অনুনয় বিনয় করল, কত ঘাটের মানুষের কাছে সন্ধান নিল।

না, কেউ দেখেনি। কোন ডুবে যাওয়া দেহ এধারে ভেসে ওঠেনি।

নদী পার হয়ে ওপারে গেল। জনে জনে খোঁজ করল। একই কথা শুনতে পেল, এপারেও কেউ দেখতে পায় নি, তার ভেসে যাওয়া বোনের দেহটা।

সে দু'ট তিনটে দিন ঘুরে ঘুরে বাড়ী ফিরে এল।

মা কাঁদতে কাঁদতে তখনো বললেন, ওরে, সে ডুবে মরেনি! কক্ষনো মরেনি। সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। এনেদে, এনেদে তোরা আমার বাছাকে!

মা আবার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

ভাইটা ফ্যালফ্যাল করে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। দিন গেল, মাস গেল, বছরের পর বছর ঘুরে গেল। তবু মা আর

খুঁজে পেল না, তার দুলালী মেয়েকে। ভাই আর দেখতে পেল না তার আদরের বোনকে।

কিন্তু মায়ের স্নেহকাতর মন এখনো বুঝতে চায় না। তার দেহটা যখন দেখা যায় নি, তখন কি করে প্রাণ থাকতে বলতে পারে, সে আর নেই ?

ভাই কোন কথা বলে না। প্রথম প্রথম সে মাকে বোঝাতে চেয়েছিল, সব লাশ ডুবে গেলে পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে জন্তুজানোয়ারে খেয়ে ফেলে।

এতে হিতে বিপরীত হয়ে যেত। অবুঝ মা ঘনঘন মূর্চ্ছা যেতেন, তিন চারদিন খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিতেন। একটু সুস্থ হলেই বলতেন, খোকা, আর বলিস নি, বলিস নি। সে মরে নি, আমি বিশ্বাস করি, সে এখনো বেঁচে আছে।

ভাইটা আর বোঝাবার চেষ্টা করত না। নীরবে চোখের জল মুছে বাইরে বেরিয়ে যেত।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

মা'র মুখের কথাগুলো শুনতে শুনতে শিক্ষিত ভাইটার মনের ভেতরেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন হতে লাগল, একটা আজব চিন্তা জাগতে লাগল, একটা অসম্ভব বিশ্বাস মধ্যে মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল।

মার সন্দেহ হয়ত সত্য, হয়ত সে জলে ভেসে গেলেও মরে নি, হয়তো এখনো কোথাও বেঁচে আছে।

আশা তার নিরাশ মনে আবার কল্পনার জাল বুনে চলে। বোধহয় তাকে আবার একদিন কোথাও না কোথাও দেখতে পাব, বোনটিকে আবার আদর করে ঘরে নিয়ে যাব।

এক সময় কল্পনার রঙিন জালটা মনের ভেতর থেকে ছিড়ে

পড়ে, তার সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধি ভেতরের মরীচিকাটাকে ভেঙ্গে দিয়ে বলে, সে নেই, সে নেই, সে নেই। ওটা তোমার নিজের দুর্বলতা, ওটা শোকে অন্ধ মায়ের মিথ্যা বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি !

বড় লজ্জিত হয় সে। নিজের বোকামোতে নিজেই হাসে সে।

তবু কি আশ্চর্য !

মিথ্যে জেনেও সে এক একদিন এ রাস্তায় সে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কিসের যেন একটা আকর্ষণে গঙ্গার ঘাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, চঞ্চল ঢেউগুলো নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে দেখতে পায়, মুহূর্তের মধ্যে সে যেন মোহাবিষ্ট হয়ে যায়।

সে গঙ্গার দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, মানুষের ছেলের কাতর ডাক শুনে তুই একদিন পাহাড়ের বুক থেকে মাটির কোলে নেমে এসেছিলি মা। আজ আর একটা ছেলে তোকে তেমনি কাতরভাবে ডাকছে মা, তুই ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে, এনেদে মা তার হারাণ বোনটাকে !

হঠাৎ একটা জাহাজের বাঁশীর বিকট শব্দ গাঁ গাঁ করে বেজে ওঠে।

চমকে ওঠে ভাইটা। তার সমস্ত শরীরটা শিরশির করে ওঠে।

তার মুহূর্তের মোহ ভেঙ্গে যায়।

গঙ্গার ঘোলা জলগুলো যেন তার পাগলামো দেখতে দেখতে হাসির হুলাৎ হুলাৎ শব্দ করে ছুটে চলে যায়।

সে নিজের লজ্জায় নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করে। কুসংস্কারের ভূতটাকে ভেতর থেকে একটা ঝটকা দিয়ে ফেলে দিয়ে গঙ্গার তীর থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

রাস্তায় এসে হাজার হাজার চলমান মানুষের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

তারপরে ছেলেটা একদিন ভাল চাকরী পায়। রোজ দশটা পাঁচটা অফিসে কাটিয়ে বাড়ীর দিকে যায়। সংস্কারটা তার মন থেকে মুছে যায়।

কিন্তু তবু বোনটার সেই চেহারা, সেই সুন্দর মুখখানা, সেই টানাটানা চোখদুটো আর হাসিমাখা সেই টোল খাওয়া গাল দুটো সে কোনদিন কিছুতেই ভুলতে পারে না।

সে ভুলতে পারে না ভাইবোনের সেই ছোটখাট খুনসুড়ি, সেই ঝগড়া, সেই কথা কাটাকাটি আর মাকে ঘিরে তাদের সেই ভালোবাসার ঘটনাগুলো।

তাইত সে পথে ঘাটে ট্রামেবাসে, এখানে ওখানে কোন সুন্দর মেয়ে দেখলেই চকচকে চোখ দিয়ে ফিরে তাকায়, কোন মেয়ের মুখের খিলখিল হাসির ঝঙ্কার শুনলেই চমকে উঠে সন্ধানী চোখদুটো বুলিয়ে নেয়, কে, কে, কে ?

পরক্ষণেই সে লজ্জা আর দুঃখের সঙ্গে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

খানিকটা সরে এসে মনকে তিরস্কার করে সে, একি মিথ্যে দুর্বলতা !

কিন্তু এ দুর্বলতাকে সে আজও ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। বাস্তবের এই রোগশোকজরা মৃত্যুভরা সংসারে শিক্ষিত ভাইটা তার এই দুর্বলতাকে গোপনে গোপনে মনের ভেতরে পুষে রাখে।

তারপর……

তারপর কেটে যায় আরও দু'টতিনটে বছর। দুর্বলতাটা তখন সমান ভার নিয়ে তার মনে চেপে বসে থাকে।

তারপর ?……

তারপর গল্পটা হঠাৎ আজ সন্ধ্যের সময় এই ঘরে এসে টপ করে শেষ হয়ে গেল।

ছেলেটার এতদিনের সব সন্দেহ আর দুর্বলতা ঘুচে গেল। সে এখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে, তার মা'র স্নেহকাতর মনের মিথ্যা বিশ্বাসকে ভর করে তার নিজের যে সংস্কারটা মধ্যে মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়, সেটা আর মোটেই মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।

তাইত ছেলেটা তোমার কাছে এবার খুব চুপিচুপি জানাচ্ছে মমতা,...মা গঙ্গা কোনদিন নিষ্ঠুর নয়। মা নিষ্ঠুর হতেই পারে না।

তাইত সে যুগেও সে যেমন ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিল, এ যুগেও সেই ছেলেটার সেদিনের সেই কাতর ডাকে ঠিক তেমনি করে আবার সাড়া দিয়েছে। হ্যাঁ মমতা, ছেলেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেই মুখ, সেই কথা, সেই চোখ, এমনকি দু'গালের সেই ছোট্ট ছোট্ট দু'টি মিষ্টি টোলের দাগ !

ভাই কি কখনো তার নিজের বোনকে ভুলে যেতে পারে, তাকে চিনতে ভুল করতে পারে? বল মমতা?

সে অনেক ছুটোছুটি করেছে, কত জায়গায় ঘুরেছে, কত সন্ধান করেছে, নিজের বোকামো আর কুসংস্কারটাকে ভেবে ভেবে আবার কতদিন নিজেই কত হেসেছে। কিন্তু আজ এইখানে এই সময়ে তার সমস্ত আশাকে সার্থক করে, তার সমস্ত অবিশ্বাসের বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার আদরের বোন, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাওয়া অভাগী মায়ের চোখের হারান আলো, তার মমতা, আবার তার দুঃখিনী মা আর তার স্নেহের কাঙাল ভাইটার কাতর ডাকে তেমনি করে হাসিমুখে সাড়া দেবে, তেমনি করে আনন্দঝরা স্বরে বলবে, তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছ দাদা। আমি তোমার বোন, তোমার সেই আদরের বোন, সেই হারিয়ে যাওয়া, ডুবে

যাওয়া মীরা আজকের এই একই মমতা। হ্যাঁ···মমতা! —ত্যি, সত্যি, সত্যি! হ্যাঁ, হ্যাঁ!

বল, একবার বল মমতা, একবার শুধু মুখফুটে বল বোন! বল,—হ্যাঁ।

আমার স্বরে আবেগ আর উত্তেজনা ঝরে পড়ে। মমতার দুচোখ বেয়ে অজস্র জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে! সে মুখ নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। খানিকটা পরে মুখ তোলে। চোখে জল নিয়ে মুখে হাসি মাখিয়ে বলে,···হ্যাঁ।

* * * *

হা হা শব্দ করে আমি অট্টহাসি হাসতে থাকি। সুশান্ত বোকা আর হাবার মত হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

(চার)

লতাবৌদির কথা

মা!

পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে মানুষের প্রিয় হল মা! একথার কোন ব্যাখ্যা নেই।

ব্যাখ্যা যে করতে যায়, সে মূর্খ। আর যে শুনতে চায় সে নির্বোধ।

সেই মা দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলেন মমতাকে। গদগদ স্বরে বললেন, আমার শন্য বক পর্ণ হল মা! খোকা আমার ঠিক

চিনেছে। ভাই কি কখনো বোনকে ভুলতে পারে? তাই কাল রাতে খোকার মুখে তোর সব কথা শুনে তখুনি উৎঠার সঙ্গে বলেছিলাম, আর দেরী করিস নি বাবা, কাল সকালেই আমার মীরাকে নিয়ে আয়। দু'টো দিন ঘরে এনে আমি তাকে খাওয়াবো পরাবো সাজাবো, তবে ত শান্তি পাব। তবে ত বিয়ে দেব।

মা জলভরা চোখে হাসেন।

এত সুখের মধ্যেও সন্দেহভরা স্বরে মমতা বলে, কিন্তু মা, আমি কি করে এখানে এসেছি, সেকথা দাদার মুখে শুনেছ?

মা হাসতে হাসতে বললেন, শুনেছি মা শুনেছি।

খোকা আমার কিছু বলতে বাকী রাখেনি। সব জেনে আর শুনেই ত তোকে পাবার জন্যে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম রে। মা যদি তার নিষ্পাপ সন্তানকে দোষী বলে ত্যাগ করে, তাহলে আর মানুষের ভাল বলতে এ সংসারে থাকবে কি? তোর জীবনের সবটুকু শুনে যেমন তোকে আনবার জন্যে ছটফট করেছি, ঠিক এমনিভাবে আর একদিন ছটফট করেছি, সবটুকু না শুনেই প্রতিমাকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে। খোকার কাছ থেকে ওর লাঞ্ছনার কথাগুলো শুনতে শুনতে নিজের মনে বারবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছি, আমি এ কি করেছি, যে মেয়েটা আমাদের দরজায় এসে আর্তস্বরে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল, তাকে আবার তাচ্ছিল্য করে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছি। সমাজ যতই ঘেন্না করুক, ধর্ম্ম যতই চোখ রাঙাক কিন্তু আমরা মা হয়ে কেমন করে এই সব নিরপরাধী মেয়েদের ফেলে দিয়ে সমাজের এই নিষ্ঠুর চোখ রাঙানীকে আর ধর্মের নামে এতবড় অধর্মের ধাপ্পাকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দিয়ে মেয়েজাতের বাস্তব অস্তিত্বটাকে পর্যন্ত মুছে দেবার মত বোকামো করতে পারি?

মা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে আবার বললেন, কি জানিস মীরা, যখনই প্রতিমার কথা মনে করে দুঃখ করতে করতে আমি এই কথাগুলো ভাবি, তখনই আমার কেমন যেন ধারণা হয়, যে অক্ষম সমাজ মেয়েজাতকে রক্ষা করতে পারে না, সেই সমাজের এই অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের গোটা মেয়েজাতটাই বা কেন বিদ্রোহ করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না ? সীতাকে জোর করে রাক্ষসে ধরে নিয়ে গিছিল, তবু সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে নিজের সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছিল। তার মনের সত্যের কোন দামই দিতে চায় নি, সেদিনকার অযোধ্যার সমাজ। আজও হাজার হাজার মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের কেউ কেউ যদিও কোন রকমে নরককুণ্ড থেকে ছটকে পালিয়ে আসছে, তবু কিছুতেই আর তার সমাজের কোনে এতটুকু ঠাঁই জুটছে না। সীতা তবু অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করে মরেছিলেন আর এ যুগের সীতার দল দরজায় দরজায় একটু আশ্রয় পাবার জন্যে মাথা কুটে কুটে ব্যর্থ হয়ে আবার পাগলের মত সেই নরককুণ্ডে ফিরে গিয়ে নিজের সতীত্বকে জ্বালিয়ে দিয়ে পরীক্ষা দেবার জন্যে তিলে তিলে পুড়ে মরছে ! বুঝলি মীরা, যতদিন না গোটা মেয়েজাতটা এই পরীক্ষার বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে, যতদিন না এদেশের মেয়েরা সমাজের অন্যায় শাসনকে অগ্রাহ্য করে আর সাহস করে এইসব অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা মেয়েদের নিজেদের মধ্যে টেনে নিতে পারছে, ততদিন তাদের এ অপমান দূর হবে বলে কিছুতেই মনে হয় না। তাইত বলছি মীরা, আমরা মেয়েরাই অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্যে মেয়েজাতের ধ্বংসের কারণ হয়ে পড়েছি। তবে সেদিন খোকা আমায় কিছুই বলেনি ত মা, তবু কেন হতভাগী প্রতিমার

৮

সব কথাটুকু না শুনে সেদিন তাকে আমি নিজেই শেয়াল কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম বলত ?

মমতা অস্থির গলায় বলল, তুমি আবার কাঁদছ মা! মা স্থিরস্বরে বললেন, হাঁ, কাঁদছি মীরা। মেয়েমানুষ হয়ে আর একটা মেয়ের দুঃখের কথা না শুনে যে অন্যায়টা করেছিলাম, সেই অন্যায়টা মনে পড়লে আজও আমি না কেঁদে থাকতে পারি না রে। আর তাই ত তোর সর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করবার জন্যে তোর দাদা তোকে আবার মা'র কোলে ফিরিয়ে এনেছে। মা এবার তার মেয়েকে সমাজ আর ধর্ম সাক্ষী করে সুশান্তের হাতে তুলে দেবে।

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে মায়ের আর মেয়ের সেই কথাগুলো শুনলাম। আমার একচোখে জল ঝরে পড়ল, আর একচোখে খুশীর আলো জ্বলে উঠল।

সুশান্ত তার পরদিন আমাদের বাড়ী এল। মা ওকে চা আর জলখাবার দিয়ে হাসিমুখে বললেন, মেয়ে আমার এখন আর তোমার সামনে বেরোবে না বাবা। হাজার হলেও মেয়েমানুষ ত, বাপের বাড়ীতে মা ভাই-এর কাছে থাকলে এ সময়ে লজ্জা একটু হয় বৈকি।

সুশান্ত মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা যেন তার বাইরের ছেলেটাকে পর বলে মনে না করেন। আমিও মা'র আদর পাব বলে আশা করে এখানে হাজির হয়েছি।

মা আগেরই মত সহজ স্বরে বললেন, আকাশে যতদিন চন্দ্র-সূয্যি থাকবে, ততদিন ছেলেদের জন্যে মায়ের প্রাণে আদরও থাকবে। মিছিমিছি দুশ্চিন্তা কোর না বাবা। আজ সকালেই

আমাদের ভটচাজ্জি মশাইকে ডেকে এনে বিয়ের দিনক্ষণ আমি ঠিক করে ফেলেছি। শুভদিনে আমার মীরাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি পরের ছেলেকে নিজের করে নেব। তখন ত আর পর মনে করে মায়ের সামনে এসে অভিমান করতে পারবে না বাবা।

মা হেসে খেললেন। হেসে ফেলল সুশান্ত।

ঘটনার গতিপথটা দুঃখের বদ্ধজলা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ সুখের স্রোতের দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে মনে করে আমিও প্রাণ খুলে হা হা শব্দে হেসে উঠলাম।

সুশান্ত তার বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করে এল।

আমি মমতাকে বললাম, তুমি তোমাদের হাসপাতালের বান্ধবী নার্শদের বলবে না মমতা?

মমতা ঘাড় নাড়ল। বলল, না, ওদের আমি বলব না। তবে লতাদিকে বলতে ইচ্ছে করে।

আমি বললাম, কে লতাদি?

খানিকটা চুপ করে থেকে মমতা বলল, যেখানে আমি থাকতাম, তার পাশের বাড়ীতেই থাকত লতাদি।

রাস্তার ধারে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমার সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলত। ওর স্বামীর মাথার একটু ছিট আছে। আগে নাকি কোথায় মোটা মাইনের কাজ করতেন। মাথার গোলমালের জন্যে কাজ গেছে; লতাদি নিজেও বেশ লেখাপড়া জানে। মেয়েদের কোন একটা স্কুলে পড়াতে যায়। যাবার আগে স্বামীকে খাইয়েদাইয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে যায়। আবার

বিকেলে ফিরে এসে রান্নাবান্না করে। একদিন সন্ধ্যেবেলা হাসপাতাল থেকে ফেরবার সময়ে শুনলাম. লতাদি সেই বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে। আমি লতাদির কাছে ছুটে গেলাম।

লতাদি আমাকে দেখে একটু হেসে বলল, তোর কথাই ভাবছিলাম মমতা। বোধহয় তোর সঙ্গে দেখা করে যাবো বলেই এতক্ষণ বেরোতে পারিনি।

আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় উঠে যাচ্ছ লতাদি? লতাদি বলল, বেশীদূরে নয় ভাই। কলকাতার মাঝ বরাবর একটা খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে নতুন চাকরী পেয়েছি। ওরা থাকবার জন্যে স্কুলের মধ্যে কোয়াটারও দিয়েছে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ওঁকে ঘরে রেখে আমি স্কুল করতে পারব। তুই কিন্তু তোর লতাদিকে ভুলে যাসনি মমতা। মধ্যে মধ্যে আমার ওখানে যাস ভাই। তবু তোর সঙ্গে দু'ট সুখদুঃখের কথা বললে একটু শান্তি পাই। এই নে, ঠিকানাটা রেখে দে।

মমতা থামল। একটু যেন কি ভেবে আবার বলল, তারপর প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। যাব যাব করেও লতাদির বাসায় যাবার সময় করে উঠতে পারিনি।

আমি প্রশান্ত স্বরে বললাম, তা বেশত, চলনা, আজই সন্ধ্যেবেলা দু'ভাইবোনে একসঙ্গে লতাদিকে নেমন্তন্ন করে আসি বলে আসি. আমার বোনের বিয়েতে লতাদিকে এবাড়ীতে আসতেই হবে।

লতাদির মিশনারী স্কুলটা আর তার পাশের কোয়াটারটা খুঁজে পেতে বেশী দেরী হল না।

নাম ধরে ডাকতেই লতাদি বেরিয়ে এল। মমতাকে দেখে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি ভেবেছিলাম, হতভাগী লতাদিকে

তুই বোধ হয় ভুলেই গেছিস। তবু ভাল, এতদিনে দিদির কথা মনে পড়েছে।

তারপরে আবার বলল, কিন্তু আজ হঠাৎ এত খুঁজে খুঁজে লতাদির কাছে এসেছিস কেন বোন ?

মমতা লজ্জিত হয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল।

আমি হাসিমুখে বললাম, মমতা আমার বোন। আসছে শুক্রবার মমতার বিয়ে। তাই আমরা ভাইবোনে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি। ঐদিন সন্ধ্যের সময়ে আপনি যাবেন দিদি।

লতাদি মমতার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে খুশীভরা গলায় বললেন, শুনে বড় আনন্দ হল ভাই। মমতা যেন চিরসুখী হয়। আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু ভাই, বিয়ের রাতে তোমাদের বাড়ীতে আমি যেতে পারব না। লতাদির এ ত্রুটী মাপ কোর তোমরা।

মমতা মুখ তুলে বলল, কেন লতাদি ?

লতাদি মুখখানা নিচু করে বলল, তোরই ভালর জন্যে মমতা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, রাগ কোরনা ভাই। শুভ কাজটা হয়ে যাক, তারপরে আমি নিশ্চয় একদিন তোমাদের বাড়ী যাব। আমি কথা দিচ্ছি।

আমি তবু জেদ করে বললাম, কিন্তু লতাদি, বিয়ের দিনে যেতে বাধাটা কি ? আর ঐ দিন না গেলে মমতার ভালটা কি এমন হবে ? বরং মমতা মনে কষ্ট পাবে।

আমি কৌতূহলী হয়ে লতাদির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তাকিয়ে রইল লতাদি আমার দিকে। দেখি, লতাদির চোখ-দুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমি খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়লাম। তক্ষুণি আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

একটু বাদে আবার কথা বলল লতাদি, দিদির বাড়ীতে দু'ভাই-বোনে যখন এতটা পথ খোঁজ করে কষ্ট স্বীকার করে এসেছ, তখন আর একটু বসে তার কতকগুলো কথা শুনে যাও। তারপর লতাদির ওপর যত খুশী রাগ আর অভিমান কোর।

লতাদি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল। ঘরের কোনা থেকে একটা মাদুর এনে পেতে দিল।

আমরা বসলাম। একপাশে বসল লতাদি।

এমন সময়ে পেছনের ঘর থেকে পুরুষমানুষের চড়াগলার একটা অট্টহাসি ভেসে এল। মনে হল, কে যেন বিকট স্বরে চীৎকার করতে করতে এ ঘরে ছুটে আসছে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে লতাদির দিকে তাকালাম। মমতা যেন খানিকটা ভয় পাবার মত করে বলল, কে ?

লতাদি শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে বলল, আমার স্বামী। ভয় পাস নি। শেকল তুলে দিয়েছি। এ ঘরে আসবে না। আর ওঁর কথাইত বলছি এবার।

আমরা স্থির হলাম।

স্থির গলায় লতাদি বলল, আজ আমি স্বামীকে নিয়েও সংসারে সমাজে একা। আর আমার স্বামী,....

পেছন ফিরে ঘরের দিকে তাকাল একবার লতাদি, আবার বলল, আমার জন্যেই উনি আজ পাগল। আমাকে বাঁচাবার জন্যে।

আবার একটু থা 'ল লতাদি। আস্তে আস্তে বলল, সতের আঠের বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার শ্বশুরবাড়ী

মেদিনীপুরে। আমার স্বামী বড়দরের সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সরকারের কতকগুলো জরুরী কাজের জন্যে ওঁকে সব সময়ে কলকাতা থাকতে হত। সরকারের কাছ থেকে উনি কলকাতায় কোয়ার্টার পেলেন। বিয়ের দু'এক বছর বাদেই উনি আমাকে কোয়ার্টারে নিয়ে এলেন।

আমার সে কি আনন্দ। রাস্তার এপারে পর পর সরকারী কোয়ার্টার, ওপারে মুসলমানদের বস্তি। আমি আনন্দে ডগ্‌মগ্‌ হয়ে সারাদিন কাজকর্ম করতাম, ওনার ছুটিছাটার দিনে, এ কোয়ার্টারে, ও কোয়ার্টারে বেড়িয়ে বেড়াতাম। সমস্ত কোয়ার্টারের মেয়েরা আমার চেনাজানা আপনার জন হয়ে উঠল।

ওনার আত্মীয়স্বজনরাও মধ্যে মধ্যে বাসায় আসতেন। ওনার মা আসতেন। দুই ছোট ভাই আর এক কাকাও মধ্যে মধ্যে এসে দু'তিন মাস করে থাকতেন। মা গঙ্গাস্নান করে এসে জপতপ সেরে আমার হাতের তৈরী গরম খাবার খেতে খেতে গদগদ কণ্ঠে বলতেন, আহা, বৌমা আমার কি পয়মন্ত। নইলে খোকার বিয়ের কথা হবার সঙ্গে সঙ্গেই কি আর এতবড় চাকরীটা হত? না খোকা এতবড় বাসাটা কোলকাতায় পেত? তোমার ভাগ্যেইত কলকাতায় এসে গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে দেহটাকে শুদ্ধ করতে পারছি মা। তোমার ভাগ্যেইত আমার সংসারে এত বাড়বাড়ন্ত বৌমা।

শ্বাশুড়ী খাবার চিবোতে চিবোতে চক্ষু বুজে আমার গুণকীর্তন করতেন। আমি কাজ করতে করতে খুশীতে উপছে পড়তাম।

কিন্তু দু'চার মাসের ভেতরেই তাঁর বৌমার ভাগ্যটা দুর্ভাগ্যের একটা নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গুড়িয়ে গেল।

চারপাঁচ বছর আগের একটা ঘটনার কথা বলছি। তখন

শীতের প্রায় শেষ দিক। খবরের কাগজে খবর বেরোতে লাগল, পূর্ব পাকিস্তানে আবার পশ্চিমা মুসলমানরা হিন্দুদের ধরে ধরে কুকুর শেয়ালের মত মেরে ফেলছে। বাঙালী হিন্দুদের জোর করে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। হিন্দুর মেয়ে বৌদের কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

খবরের কাগজের মর্মান্তিক বিবরণগুলো ছু'একদিনের মধ্যেই এদেশের হিন্দুদের গরম করে দিল। ওদেশ থেকে যেসব হিন্দু পালিয়ে এসেছিল, তারা কেউ কেউ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠল,...বদলা নিতে হবে!

অনেকেই অস্থির হয়ে উঠল,...মারের বদলে মার দিতে হবে!

সুযোগসন্ধানী মানুষের দল চঞ্চল হল; দাঙ্গা আর খুনজখমের তাণ্ডব সৃষ্টি করে লুটপাটের দ্বারা কাজ গুছোতে হবে!

দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। কলকাতার ভেতরে বাইরে দাঙ্গা বেধে গেল। এখানে ওখানে মুসলমানের বস্তি আর হিন্দুর পাড়া জ্বলতে লাগল। হিন্দুর পাড়ায় হিন্দুর লাঠিতে মুসলমান খুন হল, মুসলমানের মহল্লায় মুসলমানের ছোরাতে হিন্দু মারা পড়ল।

আমাদের কোয়ার্টারগুলোর খানিকটা তফাতেই মুসলমানদের বস্তি। কোয়ার্টারের সবাই আতঙ্কিত হল। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার মুসলমান বাস করে ওখানে। আমরা ত মাত্র পঁচিশ ত্রিশ ঘর। তাও দিনের বেলা জোয়ান মানুষেরা চাকরী করতে চলে যায়। মেয়েরা বাচ্চারা আর অক্ষমরা বাড়ীতে থাকে। আর থাকে ছু'একজন চাকরবাকর।

গণ্ডগোল বেড়ে উঠল। চাকরবাকরেরাও আর থাকতে চাইল না। প্রাণের মায়ায় অনেকে কোয়ার্টারের চাকরীর মায়া ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টারের বাবুরাও পালাতে আরম্ভ করল। ছেলেপিলে নিয়ে নিরাপদ হবার জন্যে কলকাতার অন্য পাড়াতে চলে গেল।

আমরা তখনো গেলাম না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা উনি বাড়ী এলে আমি বললাম, হ্যাঁগো, সবাই যে চলে যাচ্ছে। এরপর একটা ব্যবস্থা কর। অন্য কোথাও বাসা না পাও, আমাকে না হয় দিনকতকের জন্য মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দাও।

উনি হেসে বললেন, কিন্তু পাঠাব কখন। এদিকে আমার উপর যে জরুরী কাজের চাপ পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আশ্বস্ত করে আবার বললেন, ভয় পেও না। পুলিশ আর সৈন্যদল সমস্ত সহরে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা মারপিট করছে, তাদের গ্রেপ্তার করছে, যারা লুটপাট খুনজখম করছে, তাদের গুলি করছে। বন্দুকধারী পুলিশ এধারে ওধারে সতর্ক হয়ে পাহারা দিচ্ছে। আজ আমাদের কোয়ার্টারের সামনের রাস্তাতেও পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া শুনলাম, ওপাড়ার বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোকেরা এই দাঙ্গা বন্ধ করবার জন্যে প্রাণ-পণে চেষ্টা করছেন, তাঁরা এ পাড়ার হিন্দু বাসিন্দাদের সঙ্গে শান্তি কমিটি গঠন করেছেন। বস্তির দাঙ্গাবাজ অবাঙালী মুসলমানরা এধারে ঘেঁষবার সাহসই পাবে না।

একটু হেসে আবার বললেন, এর পরও যারা কোয়ার্টার ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তারা ভীতু আর বোকা। তবু আজ রাত্রে যদি আরো গণ্ডগোল বাড়ে, কাল তাহলে না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

সেই রাতে কোন গণ্ডগোল হল না। তার পর দিনও না। বরং

গণ্ডগোল যেন কমে গেল। মনে হল, সব থেমে গেল।

যারা কোয়ার্টার থেকে পালিয়েছিল, তারা কেউ কেউ আবার ফিরে এল। আমাদেরও মনে বল ফিরে এল। উনি হেসে বললেন, এখন আর মেদিনীপুরে বেড়িয়ে আসা মহাশয়ার ভাগ্যে নেই। এ পাড়ার ও পাড়ার হিন্দু আর মুসলমান ভদ্রলোকেরা একজোট হয়ে গুণ্ডাদের মতলবগুলো সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে। এতে আর আমি কি করব বল?

উনি হাসতে হাসতে অফিসে চলে গেলেন। আমিও সংসারের টুকিটাকি কাজ সারতে লাগলাম। একসময় বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, রাস্তা থেকে বন্দুকধারী পুলিশরা চলে গেছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে, মানুষ যাচ্ছে। এ'কদিনের নির্জন রাস্তাটা ভয়শূন্য মানুষের চলাফেরায় আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

আমিও শান্ত মন নিয়ে দুপুরের দিকে ঘরে বসে ছিলাম। একটা গল্পের বই পড়ছিলাম।

হঠাৎ দূর থেকে কি যেন একটা গোলমাল শোনা গেল। মনে হল, অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে চীৎকার করতে করতে যেন আমাদের কোয়ার্টারগুলোর দিকে ছুটে আসছে। আমি চমকে উঠলাম। কান খাড়া করে রইলাম।

গোলমাল আরো বাড়তে লাগল। অনেক মানুষের উৎকট চীৎকার আরো জোরে ভেসে এল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

কি দেখলাম?...

দেখলাম, দিগন্তজোড়া মানুষের স্রোত। আকাশ ফাটান চীৎকার,...আল্লা হো আকবর!

কোতল কর, খতম কর, লুট কর।

হাজার হাজার লাঠি ঘুরছে, রোদ্দুরে ছোরাছুরিগুলো ঝকঝক করছে!

বন্দুক আর বোমার শব্দ কান ফাটিয়ে দিচ্ছে।

ওরা দলে দলে এদিকে ছুটে আসছে,…রাস্তা পার হয়ে আমাদের কোয়ার্টারগুলোর দিকে।

আমি খানিকটা যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম।

একবার মনে হল, ভেতরে যাই। দোর বন্ধ করে দিই। আবার মনে হল, দরজা ভেঙ্গে ঢুকবে ওরা। কোথায় লুকোব?

আবার চীৎকার! একেবারে রাস্তার ধারে।

রক্তলোভী হিংস্র জানোয়ারের গর্জন! রক্ত পান করতে চায় ওরা।

আল্লা হো…হো…হো… হো…

হঠাৎ আমার বুদ্ধি ফিরে এল।

তাইত, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মরতে হবে যে। পালাতে হবে, অন্য কোয়ার্টারে, পাশের কোয়ার্টারে, ওখানে আরো অনেক লোক আছে।

বিপদের সময় মানুষের কথা মনে পড়লে মানুষের মনে বল আসে, মানুষের সঙ্গ পেলে মানুষের প্রাণে সাহস জাগে।

মনে খানিকটা বল ফিরে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পা দু'টোতে জোর ফিরে পেলাম।

হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম।

মানুষ দেখলাম। আমারই মত কতকগুলো মেয়েমানুষ আর বাচ্চা ছেলেমেয়ে।

কোয়ার্টারের পেছনদিককার বাগানে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর হাউমাউ করে কাঁদছে।

পাশের কোয়ার্টার থেকে একটা চোদ্দপনের বছরের ছেলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাস্তা থেকে মিলিটারী পুলিশ উঠে গেছে, কোয়ার্টারের পাহারাদার পুলিশ চলে গেছে, গোলমাল থেমে গেছে জেনে এধারের ওধারের কাজের মানুষেরা যে যার নিজের কাজকর্মে চলে গেছে। ওরা, ওই বস্তির গুণ্ডা মুসলমানগুলো সব খবর নিয়েছে। তাই তৈরী হয়ে এই ফাঁকা দুপুরে ঝাঁক বেঁধে খুন করবার আর লুট করবার মতলবে ছুটে এসেছে। চাকরবাকরগুলো প্রাণের ভয়ে এদিক ওদিক ছটকে পালিয়ে গেছে। এখন উপায় ?

বুঝতে পারলাম, উপায় আর কিছুই নেই। হয় দাঁড়িয়ে ওদের হাতে মরা, না হয় ওদের কবলে পড়া।

শরীরটা আবার ঝিমঝিম করে উঠল। মাথাটা ঘুরতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখলাম।

ওরই মধ্যে শুনতে পেলাম, ওরা বাইরের দরজা ভাঙ্গছে, চীৎকার করছে, বিকটস্বরে হল্লা করছে।

হো···হো···হো···হো···

হুড়দাড় শব্দ করে বুঝি একটা দরজা ভেঙ্গে গেল, আমি চমকে উঠলাম। হতভম্ব হয়ে আবার দেখবার চেষ্টা করলাম।

এমন সময় সেই ছেলেটি আবার চেঁচিয়ে উঠল, আর উপায় নেই। পুলিশ খবর পেয়ে আসতে আসতে ওরা সব শেষ করে দেবে। তোমরা যদি বাঁচতে চাও, এই বাগানটার পেছনদিককার পাঁচিল টপকে ওধারে পালিয়ে যাও। ওধারে সাহেবপাড়া আর

খ্রীষ্টানপাড়া। ওরা মুসলমান নয়। পালাও, পালাও এক্ষুনি, পালাও সবাই!

অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখলাম আমরা।

তুফান তরঙ্গের মধ্যে একটা ভেলা দেখলাম যেন!

বাঁচব না জেনেও বাঁচবার একটা শেষ চেষ্টা করলাম।

বেশ খানিকটা সময় চুপ করে রইল লতাদি। চোখ দুটো বুজে রইল। আমরা দু'ভাইবোনে লতাদির মুখের দিকে উৎকণ্ঠা ভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

লতাদির সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, বোজা চোখ দুটো থেকে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

খানিকটা নিঃশব্দে কাঁদল লতাদি। তারপর চোখ মুছে আবার বলল, কিন্তু এখন মনে হয়. সেদিন বাঁচবার জন্যে চেষ্টা না করলেই ভাল হত। তাহলে আজ এই রক্তমাংসের জলজ্যান্ত দেহটা নিয়ে বেঁচে থেকেও সারাটা জীবন ধরে এমনভাবে ধিকিধিকি তুষের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে হত না।

আবার একটু থামল লতাদি। একটা বড় করে নিঃশ্বেস ফেলল। নিজের আবেগকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল....আমরা উঠেছিলাম এক ফিরিঙ্গি সাহেবের বাড়ীতে।

সন্ধ্যের পর পুলিশ খবর পেয়ে আমাদের লালবাজার থানায় নিয়ে গেল। আমি ওনার অফিসের ঠিকানা দিলাম। তারপরের দিন সকালবেলায় উনি লালবাজারে এলেন॥

আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে উনি বললেন, আমাকে মাপ কর লতা। সব গণ্ডগোল মিটে যাওয়ার পরেও ওরা যে এমনভাবে ঐ

কোয়ার্টারগুলো আক্রমণ করবে, এ আমি ভাবতে পারিনি। আর পুলিশও ভাবতে পারেনি, নইলে ওরা কি মিলিটারী পুলিশ তুলে নিত ?

যেতে যেতে আবার বললেন, কাল সারাটা রাত তোমার জন্যে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করেছি। অফিস থেকে পুলিশের ফোন পেয়ে ছুটে চলে এসেছি। এখন চল, একটা হোটেল থেকে যাহোক কিছু খেয়ে নিয়ে নগেনদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে আপাতত তিন-চারদিনের জন্যে তোমাকে রেখে আসি। এরপরে আসছে শনিবারে তোমাকে দেশে নিয়ে যাব। পরে পুলিশের জিম্মা থেকে কোয়ার্টারের মালপত্তর ফিরে পেলে কলকাতায় নিরাপদ যায়গায় একটা ভাল বাসা ভাড়া নিয়ে তোমাকে মেদিনীপুর থেকে নিয়ে আসব।

হোটেল থেকে খেয়ে আমরা দুপুরের দিকে শ্যামবাজারে গেলাম। নগেনঠাকুরপো ওনার পিসতুত ভাই। কলকাতাতে নিজেদের বাড়ী। মা বউ ছেলেমেয়ে আছে। আমাদের কোয়ার্টারে কতদিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেছে। দু'একদিন থেকেও আসত।

সন্ধ্যের সময় নগেনঠাকুরপো বাড়ী এল। আমাদের দেখে বলল, তাহলে বৌদিকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছ দাদা! কাল রাতে কিন্তু তোমার ছুটোছুটি দেখে আমরা মহা ভাবনায় পড়েছিলাম। তা'ছাড়া আজ সকালের খবরের কাগজে এই লুটপাটের ভয়ানক খবরগুলো পড়ে মনটা আরো দমে গিছিল। কাগজে লিখেছে, পাশের বস্তির মুসলমান গুণ্ডারা কোন কোন মেয়ে-বউকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রেখেছে। কারো কারো সন্ধান নাকি এখনো পাওয়া যায় নি। তা' বৌদিকে উদ্ধার করে আনলে কেমন করে ?

নগেন ঠাকুরপোর কথায় কেমন একটা সন্দেহের ছোঁয়াচ ছিল।

তবু উনি স্পষ্ট গলায় বললেন, আমাকে উদ্ধার করতে হয়নি। পাশের সাহেবদের বাড়ীতে আরো অনেকের সঙ্গে পালিয়ে গিছিল। সেখান থেকে পুলিশ নিয়ে যায় লালবাজার থানায়। আমি থানা থেকে নিয়ে এসছি।

নগেন ঠাকুরপো আর কিছু বলে না।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরপোর মা এসে বললেন, বৌমা, এই তোলা উনুনটা নাও। চালডাল তরীতরকারী সব দিচ্ছি। তুমি বরং তোমাদের ছুটো ডালভাত ফুটিয়ে নাও।

উনি কলতলায় চান করতে গিছিলেন। ওপরে এসে কাপড় পরছিলেন। আমার কাছ থেকে রান্নার খবরটা শুনে বললেন, সেকি, এইত দেখে এলাম তলার রান্নাঘরে পিসিমা রান্না করছেন। তবে আবার তোমাকে এখানে আলাদা করে রাঁধতে বললেন কেন?

এমন সময় নগেন ঠাকুরপো উপরে এল। উনি বললেন, পিসিমা এসব কি বলে গেলেন নগেন! তোমার বউদি উপরে আলাদা রান্না করবে কেন?

নগেনঠাকুরপো আমতা আমতা করে বলল, না, মানে, মা কাল দুপুরে তোমাদের ঐ কোয়ার্টারগুলো থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়ার খবরটা আমার কাছ থেকে শুনেছিলেন কিনা। তাই বোধহয় ভেবেছেন, বৌদিকে বুঝি ধরেটরেই নিয়ে গিছিল। কি জান দাদা, হাজার হলেও মেয়েমানুষ ত, তার উপর আবার সেকেলে বুড়ো মানুষ। তাছাড়া তুমি ত জানই, মা'র আমার বরাবর একটু জাত-অজাতের শুচিবাই আছে।

নগেনঠাকুরপো হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। উনি নগেনঠাকুরপোর দিকে চেয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, তা জানি, তবে ঐ শুচিবাইটা তোমার উপরেও ভর করেছে নাকি? কিন্তু

তোমার বউদিকে মুসলমান গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যায়নি। একটু আগে এ খবরটা আমিইত তোমাকে দিয়েছি। তবে পিসিমাকে সত্যি ঘটনাটা জানিয়ে বুড়োমানুষের মিথ্যে সন্দেহ আর শুচিবাইটাকে কাটিয়ে দিলে না কেন ?

নগেন বোকার মত হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল।

উনি আবার বললেন, তুমি পুরুষমানুষ। লেখাপড়া শিখেছ। আবার কলকাতা সহরে বাস কর। তবু তোমারও মনে এসব মেয়েলীবাতিক আছে দেখছি। আর আছে বলেই তুমি নিজেই কতকগুলো মনগড়া কথা বলে পিসীমাকে তাতিয়ে দিয়েছ।

তবে শোন নগেন, আমিও হিন্দুর ছেলে। জাতের অস্তিত্বটা আমিও মানি। কিন্তু তোমাদের মত জাত রক্ষার দোহাই দিয়ে নির্দোষ আর নিষ্পাপ মানুষকে জোর করে বাড়া থেকে তাড়িয়ে দিলেই হিন্দুধর্মের শক্তি আর মাহাত্ম্যটা বজায় থাকে,—এ অন্ধ গোঁড়ামাটা বিশ্বাস করি না। এ যুগে যারা খানিকটা লেখাপড়া শিখেছে, তাদের কেউ যে আজও এই রকম বিশ্বাস করে, এটা আমি ভাবতেই পারি না।

নগেন হাসতে হাসতেই বলল, তাহলে আমি কি লেখাপড়া কিছু শিখিনি বলছ ?

উনি রাগের সঙ্গে বললেন, তাইত আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি কি করে এসব গোঁড়ামী স্বীকার করছ !

নগেন আগেরই মত হেসে বলল, আমাকে যে গোঁড়াদের নিয়ে ঘর করতে হয় দাদা। তা'বলেত আর নিজের ঘরসংসার ত্যাগ করতে পারি না।

উনি আমার দিকে ঘুরে বললেন, লতা, আর এখানে রান্নাবান্না করতে হবে না। এখুনি এখান থেকে চল। হাতে পয়সা আছে

যখন, তখন খাবার বা থাকবার ভাবনা কি? এ ক'দিন কোন হোটেলে-মেসে গিয়ে থাকব। তারপরে দেশে চলে যাব।

নগেন ঠাকুরপোর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

রাস্তায় যেতে যেতে উনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, এই নগেনকে দেশ থেকে আমিই কলকাতায় নিয়ে এসেছিলাম। চেষ্টা করে আমার অফিসে চাকরী করে দিয়েছি। অথচ একটা মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে আজ আমাদের সরিয়ে দিলে। একফোঁটা মনুষ্যত্ববোধও ওদের হল না।

মনুষ্যত্ববোধ! নগেন ঠাকুরপোর চেয়ে ওনার আরো কাছের মানুষদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওনার আপন ভাই, কাকা, এমন কি গর্ভধারিনী মা পর্যন্ত, কিন্তু রক্তের সম্পর্কে আপন বলে একটা মানুষেরও কাছ থেকে উনি মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় পেলেন না।

বুঝতেই পারছ, তারপরের শনিবারে আমরা মেদিনীপুরের বাড়ীতে গেলাম।

যাওয়াই সার হল, ঠাঁই পেলাম না।

রবিবার সকালবেলা ওনার কাকা পাশের বাড়ী থেকে ওদের বাড়ী এলেন। একটা নিমের কাঠি নিয়ে দাঁতন করতে করতে বললেন, তা সতীশ, খবরের কাগজে ত পড়লাম, ক'দিন আগে কলকাতায় মুসলমানরা হঠাৎ কতকগুলো হিন্দুর মেয়ে বৌকে লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তা' ছাড়া আবার নগেনের চিঠিতেও পরশু জানলাম, তোমার গিয়ে, ঐ আমাদের লতা বৌমা নাকি বাসায় একলা ছিল, তারপরে সেদিন দুপুরের দিকে হাজার হাজার মুসলমান বাসায় চড়াও হয়ে···

কাকার মুখের কথা শেষ হবার আগেই উনি যেন

একরকম চীৎকার করেই বললেন, নগেন মিথ্যে কথা লিখেছে। মুসলমানরা চড়াও হবার আগেই লতা পালিয়ে গিছিল। আমি ওকে থানা থেকে নিয়ে এসেছি।

কাকা নির্বিকার কণ্ঠে আবার বললেন, তবে ত নগেন এমন কিছু মিথ্যে লেখেনি বাবা। তুমি কিছু নিজের চোখে দেখতে যাওনি, পুলিশ বৌমাকে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। ওর মুখের কথাটুকুই শুনেছ শুধু।

উনি আরো উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ওর মুখের কথাটা মিথ্যে হবে আর নগেনের চিঠির কথাটা নিঃসন্দেহে সত্যি হবে? আমি বলছি কাকা, এ কথাটা শুধু ওর মুখের নয়, পুলিশও একথা বলেছে।

উৎকণ্ঠা নিয়ে উনি তাকিয়ে রইলেন কাকার দিকে। কাকা তাকিয়ে রইলেন, বাড়ীর রান্নাঘরের দিকে। ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, বৌঠান, গাঁয়ের পাঁচজনে বলাকওয়া করছে, সতীশের ও বৌকে এ বাড়ীতে ঠাঁই দিলে, হাঁড়িহেঁসেলে ঢুকতে দিলে, এ বাড়ীতে গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত আর ঢুকবে না. মানুষ ত দূরের কথা। এখন তোমার ছেলের কথামত বৌএর মুখের কথা বিশ্বাস করে ছেলেবৌকে ঘরে নেবে কিংবা গাঁয়ের মানুষের কথাটাকে বিশ্বাস করে গাঁয়ের সমাজের মধ্যে বাস করবে? গ্রামেই যদি থাকতে চাও, তাহলে আমার কথাটাকে একটু বিবেচনা করে দেখ।

দাঁতন করতে করতে বেরিয়ে গেলেন কাকা।

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে উনিও আবেগ ভরা স্বরে বললেন, মা!

রান্নাঘর থেকে কোন সাড়া এল না।

উনি একদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিকটা পরে বললেন, তবে কাকার কথাই তুমি রাখ মা। আমরা আবার চলে যাচ্ছি। আর গাঁয়ে আসব না। তবে যাবার সময়ে তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি, আমি পুরুষমানুষ, গ্রামের কথায়, কাকার কথায়, এমনকি তোমার কথাতে পর্যন্ত একটা নির্দোষী মেয়েকে দূর করে দিয়ে নিজের ধর্মের আর সমাজের মাহাত্ম্যকে বড় করতে পারব না।

সেদিন সে বাড়ীতে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের সমাজের আর ওনার ঐ আপনজনের মনুষ্যত্বের একটা চরম দৃষ্টান্ত আমি প্রত্যক্ষ করলাম আর অন্তরে অন্তরে আর একজন মানুষের নিঃসঙ্গ মনুষ্যত্বের জ্বলন্ত উত্তাপ অনুভব করে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

একসময় উনি আমার একটা হাত চেপে ধরতে আমার চমক ভাঙ্গল।

উনি ধরা গলায় বললেন, লতা, ফিরে চল। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তোমার পাশেই থাকব। সমাজ, ধর্ম, মা-ভাই, সবাই আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করব না। আমি যদি মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই, তাহলে তোমাকেও যেন বাঁচাতে পারি।

আমরা ফিরে এলাম। কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে মা যে ছেলের বৌকে পয়মন্ত বলে আদর করেছিলেন, ছেলের সেই বৌকে মুসলমানে ছুঁয়েছে, সমাজ তাকে দূর করে দেবার ঘোষণা জারি করেছে, আপনজন তাকে পচাগলা মৃতদেহের মত ঘেন্না করেছে। তাই ত সে বৌ এখন অপয়া অলক্ষ্মী আর অস্পৃশ্য হয়ে গেছে।

তাকে গ্রহণ করার পাপে, তাকে রক্ষা করার স্পর্ধায় মায়ের পেটের সন্তান পর্যন্ত পর হয়ে গেল, মায়ের কোল থেকে জীবনের মত বিতাড়িত হল।

উনি কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে শ্যামবাজারের দিকে বাড়ী ভাড়া নিলেন।

দিনকতক বেশ সহজভাবেই কেটে গেল। উনি অফিস করতে লাগলেন, আমি সংসার গড়তে লাগলাম।

কিন্তু কিছুদিন পরে ওনাকে আবার কেমন অস্থির আর দুশ্চিন্তাকাতর বলে মনে হল।

একদিন সন্ধ্যের সময় চায়ের কাপ হাতে দিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তুমি কিছু ভাবছ মনে হয়। আবার কিছু হয়েছে নাকি?

আমার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন উনি। দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা অস্থিরতা, কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এমন করে দেখছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

হঠাৎ উনি চীৎকার করার মত গলা চড়িয়ে বললেন, কেন ওরা তোমার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে এমন জঘন্য রসিকতা করবে? কেন ওরা বলবে, তুমি নাকি খুব সুন্দরী, তাই মুসলমানে তোমায় ধরে নিয়ে গেলেও তোমার রূপের মোহে পড়ে আমি তোমাকে আবার ঘরে এনেছি? কেন এ মিথ্যে অপবাদ ওরা দেবে? কেন?

যেন প্রশ্নটা আমাকেই করছেন, এমনভাবে রক্তচক্ষু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কারা বলেছেগো, এসব কথা?

আমার কথায় উনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ আর গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললেন, বুঝতেই পারছ ত। বলে ওই অফিসের ওরা, যারা আমার সঙ্গে কাজ করে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমিও আশ্বস্ত হলাম। সান্ত্বনার স্বরে বললাম, বলুকগে, ওসব কথা গ্রাহ্য কোর না তুমি।

উনি চেয়ারে মাথা রেখে বললেন, এই ক'দিন তাই করিনি। কিন্তু আজ দুপুরে যখন চা খাচ্ছিলাম, তখন পাশের ঘর থেকে ওদের একটা কথা শুনে হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে উঠল। কে একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, এইত সেদিন মুখুজ্যে সাহেবের বৌকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেল, তাতে কি হল, আরে রূপের কাছে কি আর জাত ধর্ম বাছবিছ আছে নাকি, না এমনধারা বোকার মত বাছবিছ করেছে কেউ কোনকালে? তাইত মুখুজ্যে সাহেব 'নেড়ে'র উচ্ছিষ্ট করা রূপসী বৌটাকে হ্যাংলার মত আবার ঘরে তুলে নিল আর মা ভাই জ্ঞাতগুষ্টিকে পরিত্যাগ করে বৌএর রাঙা পায়ের তলায় দেহিপদপল্লবমুদারম্ বলে মাথা লুটিয়ে দিল।

কথাগুলো বলতে বলতে উনি আবার যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গরগর করতে করতে বললেন, এমন সব অভদ্র আর অশ্লীল মিথ্যে কথা শুনলে কার মাথা ঠিক থাকে বল?

আমি মাথা ঠিক করতে পারি নি। আমি তক্ষুনি জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঘরে ছুটে গিয়ে লোকটাকে আচ্ছা করে দু'ঘা দিয়ে দিলাম। মিথ্যে কথার ফলটা বুঝিয়ে দিলাম।

একমুহূর্তে তাঁর রাগ পালটিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, লোকে কিছুতেই আমার ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আবার শুনলাম, কেউ কেউ বলছে, মুখুজ্যে পাগল হয়ে গেছে। বৌএর জন্তে ওর আর মাথার ঠিক নেই।

আবার হাসি বন্ধ করলেন। চোখ পাকিয়ে দাঁত কড়মড় করতে করতে বললেন, বুঝলে লতা, নির্দোষ মেয়েমানুষের নামে যারা অপবাদ দিয়ে বেড়ায়, তাদের ঐরকম শাস্তি দিতে হয়, ঘুষি মেরে তাদের নোংরা মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। আবার বলে কিনা, আমি পাগল হয়ে গেছি।

কথাগুলো বলে আবার উনি হা হা শব্দ করে হাসতে লাগলেন। ওঁর ওই অস্বাভাবিক একটানা হাসি শুনতে শুনতে আমি শিউরে উঠলাম। মনে হল, ওনার মাথাটা বোধহয় সুস্থ নেই, উনি বুঝি আমার অপবাদের কথাটা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে সত্যিই কি পাগল হয়ে যাবেন নাকি ?

আমি ওঁকে স্থির করবার জন্যে হাসতে হাসতে বললাম, ওসব কথায় আমোল দিও না তুমি। তুমি গ্রাহ্য না করলে দেখবে, দিনকতক বাদেই আবার সবাই চুপ করে যাবে, সবাই ভুলে যাবে। এমন কি শেষটাতে তোমার আপনজনেরাও চুপ করে যাবে। আবার সব মিটে যাবে। সবাই আমাদের কাছে আসবে। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবেই হবে।

লতাদি বড় করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আবার বললেন, কিন্তু এ সংসারে সত্যটাই বারবার মার খায়, বারবার সংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গুড়িয়ে যায়।

দিনকতক পরেই আর একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে ওনার সত্যরক্ষার সংকল্পটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেল। সেই সঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল ওনার চঞ্চল মনের শেষ শক্তিটুকু।

মাসখানেক আবার স্বাভাবিকভাবে কেটে গেল।

একদিন সকালে উনি অফিস যাবেন বলে পোষাক পরছেন,

এমন সময় ওর ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ওর মা এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

উনি চমকে উঠে বললেন, একি, মা তুমি।

মা নীরস গলায় বললেন, হ্যাঁ, আমি এসেছি। তোকে একটা কথা বলতে এসেছি। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, লোকে যখন একবার বদনাম দিয়েছে, তখন আর সেটাকে মুছে ফেলতে পারবি না। তুই বৌমাকে নিয়ে আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবি না। মা ভাইকে ত্যাগ করে অধর্ম করিস নি। তার চেয়ে বৌমাকে কোথাও পাঠিয়ে দে। আর মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দে। আমি আবার তোর বিয়ে দেব। এর মধ্যে কতলোক এসে তাদের মেয়ের জন্যে সাধাসাধি করছে। তুই নতুন করে সংসার পাতবি। আমি আবার এসে তোর কাছে থাকব, গঙ্গাস্নান করব, তীর্থধর্ম্ম করব। তুই না হয় মধ্যে মধ্যে গিয়ে বৌমাকে দেখে আসিস। এতে কেউ কোন কথা বলবে না, কেউ নিন্দে করবে না, অপবাদ দেবে না। আমাদের সংসারে সমাজে পুরুষমানুষের কোন দোষ হয় না, পুরুষ কোথাও গেলে তার জাতধর্ম্ম যায় না।

উনি মা'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, যেন মানুষ নয়, একটা পাথরের মূর্তি।

কোন কথা বললেন না, বোধহয় বলতে পারলেন না।

মা আবার বললেন, আমার কথার উত্তর দে। আমার মুখের দিকে, তোর ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ।

তবুও জড় হয়ে গেলেন উনি। বোবা হয়ে গেলেন॥

তাকিয়ে দেখছিলেন তখনো। কিন্তু সেটা সুস্থ মানুষের চাউনি নয়।

বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

তারপরে একটু যেন নড়ে উঠলেন। শুধু নড়া নয়, এবার ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতে টলতে লাগলেন। একনিমেষে বোবা গলা চিরে একটা তীব্র আর্তনাদ ছুটে বেরিয়ে এল, না, না, না!

চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে মেঝের উপর পড়ে গেলেন।

আমি গলা ছেড়ে জোরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। কাছে গিয়ে মাথাটা কোলে তুলে নিলাম।

গোলমাল শুনে পাশের ঘর থেকে বাড়ীওলার মেয়েরা ছুটে এল।

আমি ওর চোখেমুখে জল দিলাম। পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলাম।

দুপুরবেলা আবার চোখ খুলে তাকালেন। কিন্তু তখন একেবারে অন্য মানুষ। একেবারে উন্মাদ।

আমার দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, আমি ওদের ভয়ে তোমাকে ত্যাগ করব না, নির্দোষকে মেরে ফেলে ধর্মকে রক্ষে করতে পারব না।

আর সঙ্গে সঙ্গে সে কি অট্টহাসি!

পরক্ষণেই হঠাৎ হাসি থামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বললেন, আমি ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র নই। প্রজাদের ভালবাসা কুড়োবার জন্যে রাম নির্দোষ সীতাকে বর্জন করে বাহবা কুড়োতে পারে। আমি কিন্তু নির্দোষ মেয়েটাকে বর্জন করে আত্মীয় স্বজন আর সমাজের বাহবা কুড়োতে পারব না। না, না, কিছুতেই না। চলে যাও তোমরা, দূর হও আমার সামনে থেকে।

একটা হাত মুঠো করে উনি যেন শূন্যে কাকে ঘুষি মারলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে ওঁকে ধরে আবার শুইয়ে দিলাম।

বিপদের উপর আবার নতুন করে বিপদ এল। তারপরের দিনই বাড়ীও'লার গিন্নী এসে বললেন, দেখ বাছা, কাল তোমার শ্বাশুড়ীর মুখ থেকে আমরা সব শুনেছি। তাহলেত আর বাপু তোমাদের এ বাড়ীতে থাকা চলে না। আমারও ত পাঁচছটা আত্মীয় স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশী আছে। তার উপর ছোট মেয়েটার আসছে মাসেই বিয়ে দেবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এখন যদি সবাই জানতে পারে, একটা মুসলমানের ঘরকরা মেয়ে এ বাড়ীতে ভাড়া থাকে, তাহলে কেউ আমার বাড়ীর ছায়াটা পর্যন্ত মাড়াবে না। কথাটা বুঝেছ ত? এখন দু'একদিনের মধ্যেই যেখানে হোক আর একটা ডেরা খুঁজে নাওগে তোমরা।

কথাগুলো এক নিঃশ্বেসে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমি অকুল পাথারে পড়লাম।

কোথায় যাব?

ঘরের ভেতর অপ্রকৃতিস্থ স্বামী। খাওয়াদাওয়া করেন না, কথাবার্তা বলেন না, অফিসে যান না। কেবল বসে বসে বিড়বিড় করেন, আমি পাগল নই, আমি মানুষ। আমি ধর্মকে রক্ষে করবার জন্যে একটা মেয়েকে মেরে ফেলতে পারব না, আমি মানুষের ধর্মকে নষ্ট করতে পারব না। কিছুতেই না।

চোখদুটো রক্তের মত টকটকে লাল। হাতদুটো মুঠো করা। যেন ঘুষি পাকিয়ে কারোকে মারবার জন্যে তৈরী হয়ে আছেন।

আমি কি করি? এ মাথা নিয়ে কেউ চাকরী বজায় রাখতে পারে না।

আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াই ?

আমার জন্যে যে আপনজন সমাজ সংসার সব ত্যাগ করতে গিয়ে নিজের সহজ সুস্থ অস্তিত্বটাকে পর্যন্ত হারাতে বসেছে, আমি তার জীবনটাকে রক্ষে করব কি করে ? ওঁকে আমি বাঁচাব কি করে ?

আমি যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলাম। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, একবার মিশনারী হাইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ মিস্ পামারের কাছে যাই। দেখি, যদি কোন উপায় হয়।

মিস্ পামারের মিশনারী স্কুল থেকেই আমি বিনা বেতনে পড়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছিলাম। তাঁরই সাহায্যে আমি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। ডিগ্রী পাশ করেছিলাম। তার পরেই আমার ওনার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বাবা আর মা অল্প বয়সে মারা গিছিলেন, অল্প মাইনের এক কেরানী কাকার সংসারে খুদকুঁড়ো খেয়ে মানুষ। ওনার মা আমাকে দেখেশুনে তবে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলের রুচি বুঝে লেখাপড়া জানা মেয়েকে ছেলের বউ করেছিলেন।

কাকার সংসারে গেলে কাকা আর ভাত দিতে রাজী হবেন না। যদি শোনেন, আমার গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগেছে, তাহলে ত আগেভাগেই দূর দূর করে বিদেয় করে দেবেন।

স্বধর্মের মানুষের লাথি খেয়ে আস্তাকুড়ের ঘেয়ো কুকুরের মত সারাজীবন হ্যাংলামি না করে, বাঁচবার জন্যে অন্যধর্মের মানুষের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে আর লজ্জা কি ?

শেষ পর্যন্ত তাই গিয়ে দাঁড়ালাম।

কল্পনাতীত করুণা পেলাম।

বুড়ী মিস্ পামার সব শুনে আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মিষ্টি গলায় বললেন, তুই এখন শ্যামবাজারে আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে মাষ্টারী কর গে'তা। পরে আমি সুবিধে পেলেই তোকে এই স্কুলে নিয়ে আসব।

আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম। চাকরী পেলাম। ওনাকে নিয়ে শ্যামবাজারে চলে এলাম।

থাকবার জন্যে রাস্তার ধারে স্কুলের একখানা ঘর পেলাম।

ঐ রাস্তার ওপাশে থাকত মমতারা।

মমতার সঙ্গে আলাপ হল, আমার সঙ্গে ওর পরিচয় হল, বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠল। কিন্তু তবু ওকে আমি আমার দুর্ভাগ্যের কথা কোনদিন বলিনি।

তার কিছুদিন পরেই এখানের হাইস্কুলে নতুন চাকরী হল। মিস্ পামার আমাকে স্কুলে বেশী মাইনে দিয়ে নিয়ে এলেন। আমাকে দু'খানা ঘরের কোয়ার্টার দিলেন। আমি এখানে নিশ্চিন্তে মাষ্টারী করি, সময়মত এসে ওঁকে দেখাশোনা করতে পারি, খাওয়াপরাশোওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, আর মধ্যে মধ্যে মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেলে ঐ পেছনের ঘরটাতে চাবী বন্ধ করে রেখে দিয়ে যেতে পারি।

এমন সময় একটা বিকট চীৎকার ওঘর থেকে ছুটে এল, আমাকে খুলে দে, আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে বাইরে যেতে দে। আমি তোদের সব ভেঙ্গে চুরমার করে দেব, তোদের জাতটাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে দেব। ছেড়ে দে, খুলে দে, খুলে দে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কার শব্দ। দরজা বুঝি ভেঙে যাবে এবার !

মমতাও ভয় পেয়ে আমাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল।

লতাদি শুখনো গলায় বলল, মাথাটা যেদিন বেশী গরম হয়ে যায়, তখন মাঝে মাঝে ঐরকম আবোল-তাবোল বকেন, চেঁচামেচি করেন, দরজায় ধাক্কা মারেন। আবার কখনো হাসেন, কখনো গলা ছেড়ে কাঁদেন, কখনো বা কাতরস্বরে কত কি বলেন !

পরমুহূর্তেই ওঘরের দরজার ওপর ধাক্কার শব্দ আর বিকট চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কানফাটান অট্টহাসির আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল,…হাঃ…হাঃ…হাঃ…হাঃ…আর ঐ সঙ্গে জড়ানগলায় ছাড়া ছাড়া কথা ছুটে এল, ওরে না, না, না, তোদের ভয় নেই, কোন ভয় নেই। আমি কিছু করব না। আমি কালাপাহাড়ের মত হব না। আমি হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করবার জন্যে মন্দির আর দেবদেবীর মূর্তি ভাঙব না, মানুষ খুন করব না। ভয় নেই রে, ভয় নেই। কিন্তু একটা কথা শোন !…

আমরা আবার কান খাড়া করে রইলাম।

পাগলের অর্থহীন প্রলাপ। তবু শোনবার জন্যে কানদুটো যেন সজাগ হয়ে উঠল।

এবার চাপা হাসির ফিকফিকে স্বর ওঘর থেকে ঝিরঝির করে ভেসে এল। তার সঙ্গে ভেসে এল মানুষটার ধীর স্থির কথা।…

আমি পাগল নইরে, পাগল নই। তোরা আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি বলে যাচ্ছি, তোরা চোখ বুজে অন্ধের মত মানুষের তাজা জীবন নিয়ে ধর্মের খেলা খেলতে খেলতে ধর্মের

জাঁতাকলে পড়ে একদিন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবি, পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি।

মমতা ফিস্‌ফিস্‌ করে ভয়জড়ান স্বরে বলল; দাদা, আমার শরীরটা কেমন করছে, মাথাটা ঘুরছে। শিগগীর এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে চল।

তাকিয়ে দেখি, মমতার মুখখানা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার হাতদুটো কাঁপছে।

আমি মমতার হাতদুটো আরও শক্ত করে ধরলাম। চটপট রাস্তায় চলে এলাম।

বাড়ী যাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

রাস্তায় এসে মমতা যেন আর্তনাদ করার মত গলা করে বলে ফেলল, দাদা।

আমি পথ চলতে চলতে শক্তগলায় বললাম, দূর বোকা মেয়ে, একটা পাগলের উল্টোপাল্টা আর আবোলতাবোল কথায় অত ভয় পাচ্ছিস কেন? যেতে যেতে মমতাকে জোর দিলাম। সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু তবু ভেতরে ভেতরে মনে হচ্ছিল, আমার নিজের মনের সমস্ত জোর যেন কে কেড়ে নিয়েছে।

কে নিয়েছে?…ঐ পাগলটা?

কি আপদ। আমি কিনা একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হয়ে ঐ পাগলটার শাসানীতে ভয় পেয়ে যাব?

মমতার জীবন নিয়ে সুশান্তের মামারা যে শয়তানীর খেলাই খেলতে চেষ্টা করুক না কেন, আমি আমার মায়ের পেটের বোন মীরার জীবনকে সুখী আর সুন্দর করে তুলবই তুলব।

মমতার হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে আমরা ভাইবোনে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম।

(পাঁচ)

কথা শেষ

বিয়েতে বিশেষ কোন আড়ম্বড় করব না ভেবেছিলাম। তবু শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছে মত বাড়ীর সামনে গোটাকতক বাড়তি আলো সাজালাম। এমন কি সানাই বাজাবার বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে ফেললাম।

একটা মাত্র বোন যে।

মীরার জন্যে মা'র কত সাধ ছিল। তা' কি একেবারে অপূর্ণ রাখতে পারি?

পাড়ার পাঁচজনকে নেমন্তন্ন করলাম। দু'এক জন আত্মীয়কেও বলে এলাম।

তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। কৌতূহল প্রকাশ করল। মীরাকে পাওয়া গেছে তাহলে?

সবাইকে বললাম, তাহলে আর এসেছি কেন? গেলেই জানতে পারবেন।

সবাইকে জানবার জন্যেই বাড়ীটা আলোয় ঝলমল করছে, লোকজনের কলরবে গমগম করছে আর সানাইএর মিষ্টি সুরের আমেজে চনমন করছে।

চনমন করছে আমার মনটা।

ছাঁদনাতলায় বর এসে দাঁড়িয়েছে।

"কনে আনো, কনে আনো—"

বরের বন্ধুরা....সুশান্তের মেডিকেল কলেজের সহকর্মীরা একসঙ্গে চেঁচামেচি করে ওঠে।

আমিও সুশান্তের একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চটপট করে ঘরের মধ্যে গেলাম।

ঘরের মধ্যে কনে সেজে মেয়েদের সঙ্গে বসেছিল মীরা।

আমায় মুখখানা তুলে দেখল। ফিক করে একটু হেসে ফেলল। আমি ডান হাতখানা মুঠো করে ওপরের দিকে তুলে রাগের ভান করে বললাম, সারাটা দিন উপোস করে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করছি দেখে বড্ড মজা লাগছে, না? তাই দাদার দিকে তাকিয়ে হাসি হচ্ছে। আচ্ছা, সাতপাকটা হয়ে যাক একবার। তারপর তোকে এখানে নিয়ে এসে গুনে গুনে সাতটা কিল লাগিয়ে হাসির শোধটা ভাল করে তুলে নেব।

এর মধ্যে ঘরের ভেতর মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মীরা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, শুনছ মা?

আমিও মা'র দিকে ঘুরে বললাম, তুমিই বলত মা, ঘাড়ে করে সাতবার ঘুরপাক দেব, আর তার দাম নেব না?

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল।

মা-ও হাসলেন। বললেন, নে বাবা, তোদের ভাইবোনের খুনসুড়ি এখন রাখ। একটু তাড়াতাড়ি কর। জামাই এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েদের উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনির মধ্যে ছ'পাক ঘোরা হয়ে গেছে!

হঠাৎ সমস্ত ধ্বনিকে চাপা দিয়ে কাদের গলার কানফাটান চীৎকার যেন দাপাদাপি করে ছুটে এল,...

এই থামো, থামো, বিয়ে বন্ধ কর তোমরা। বন্ধ কর সাতপাকের কাজ।

বিয়ে বাড়ীর আনন্দকলরব থমকে থেমে গেল। আশ্চর্য হয়ে, হতচকিত হয়ে, উৎকণ্ঠা নিয়ে চুপ করে গেল সমস্ত মানুষগুলো।

আচমকা এমনধারা কথার চাবুক দিয়ে কে আঘাত করল এই উৎসবের উচ্ছ্বাসকে ?

কে বাধা দিতে সাহস করল বিয়ের শুভ কাজকে ?

আমি চমকে উঠলাম। কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির করে উঠল।

কে বলছে এ কথা ? কারা এসেছে বাড়ীতে ?

কোন সাহসে, কিসের অধিকারে বিয়ের কাজ বন্ধ করবার জন্যে এমন ভাবে হুকুম করছে ?

এমন তেজের সঙ্গে শাসাচ্ছে ?

এক নিমেষে আমি আবার শক্ত হতে চাইলাম।

মনকে জোর দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

সাতপাকের পিঁড়িটা দু'হাতে আরো শক্ত করে চেপে ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম।

বাড়ীতে ঢোকবার সদরদরজার কাছ থেকেই চীৎকারটা এসেছিল। দেখতে চাইলাম, কারা আছে ওখানে।

সুশান্তের বন্ধু পিঁড়ির একধার একটু তুলে ধরে আমাকে শুনিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, দাদা, সুশান্তের বড়মামা আর ছোটমামা এসেছেন। ওঁরাই চীৎকার করছেন।

আমি চমকে উঠলাম।

বড়মামা....ছোটমামা!

আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। জোর করে মনে যেটুকু বল এনেছিলাম তা' আবার হারিয়ে ফেললাম।

সুশান্তের বন্ধুকে বললাম, ব্যাপারটা কি! ওরা এ সময়ে এখানে এসে কি বলতে চান?

এরমধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বোবা মানুষগুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ওঁরা দু'জনেই একেবারে আমাদের সামনে এসে হাজির হলেন।

একজন গলার পর্দাটা চড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের ভাগ্নে সুশান্তের সঙ্গে তোমার জলে ডুবে যাওয়া বোন মীরার বিয়ে দিচ্ছ না। মীরার নাম করে পাঁচটা আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শীকে ভুল বুঝিয়ে উনিশ'শ পঞ্চাশ সালের দাঙ্গায় পাকিস্তানের ভেতরের একটা গ্রামের একটা ধর্মচ্যুতা জাতিচ্যুতা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ। আমরা জোরগলায় বলে যাচ্ছি এই মেয়েটার নাম মমতা। দাঙ্গার সময় মুসলমানরা ওদের গ্রামে ঢুকে মমতার বাপমাকে মেরে ফেলেছিল, মমতাকে লুট করে নিয়ে গিছিল, ওদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল, ওদের ভাত খাইয়েছিল। তার পরে········

না, না, না,······

একটা কাতর আর্তনাদ!

পিঁড়ির উপর বসে থাকা মমতা চীৎকার করে উঠল।

আমি উৎকণ্ঠা নিয়ে মমতার দিকে ফিরে তাকালাম। ওর মাথার ওড়নার ঘোমটা খসে পড়েছে, গায়ের টকটকে লাল রঙের বেনারসী সাড়িখানা এলোমেলো হয়ে সরে গেছে, টানা-টানা চোখ দুটো যেন দপদপ করে ঠিকরে বেরোচ্ছে।

মমতা হাঁপাচ্ছে। ফুলে ফুলে উঠছে।

কাঁপা-গলায় উত্তেজনার স্বরে সুশান্তের দিকে তাকিয়ে সে বলল, না, না, এসব ওদের মিথ্যে কথা, সাজান কথা, বিশ্বাস কোর না তুমি! আমি তোমাকে যা বলেছি, সব সত্যি। বর্ণে বর্ণে সত্যি। ভগবানের দোহাই, তোমাকে ঠকাতে চাইনি আমি!

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল মমতা। তার গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পিঁড়ির উপর ঢলে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, পিঁড়ি নামাও, পিঁড়ি নামাও, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখুনি গড়িয়ে পড়ে যাবে যে।

আমরা পিঁড়ি নামালাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুশান্তের ক্রুদ্ধ গলা শুনতে পেলাম,...... তারপরে মমতার কি হয়েছিল আপনাদের বলতে হবে আর এই কথাগুলোর প্রমাণ দিতে হবে।

ঘুরে দেখলাম, সুশান্ত বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে তার দুই মামার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'ট হাত দিয়ে তাঁদের দু'জনকেই যেন আগলে ধরেছে। তাঁদের চলে যেতে দেবে না সে।

তাঁদের একজন আমতা আমতা করে বলছেন, হ্যাঁ, তোমাকে আমরা অনেকবার বারণ করেছিলাম। প্রমাণও দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাদের কথাকে গ্রাহ্য করোনি। বেশ, প্রমাণ চাও, প্রমাণ আমরা দেব।

আর এক মামা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, নইলে মামা হয়ে কি আর শুধু শুধু নিজের একটা মাত্র ভাগ্নের বিয়েতে বাধা দিতে আসি? আপনারাই পাঁচজনে মনে মনে চিন্তা করে

দেখুন, সত্যি কিছু না থাকলে আমরা এখানে ছুটে আসব কেন। আমাদের জাতের আর ধর্মের মুখ রক্ষে করা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আপনারা আগে সবটুকু শুনুন, দরকার হলে খোঁজ-খবর নিন, তারপরে নিজেরাই বিচার করে দেখুন। চোখের সামনে মুসলমানের ঘরে লুট করা একটা মেয়ের সঙ্গে নিজের আপনজনের বিয়ের মত কাজটা আপনারা কি হিন্দু হয়ে মেনে নিতে পারেন? আর আমাদের কথা যদি মিথ্যেই হবে, তাহলে আমাদের ভাগ্নে সুশান্ত আমাদের সামনে বিয়ে না করে বন্ধুর বাড়ীতে এসে মেয়েটাকে বন্ধুর বোন বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এমন লুকিয়ে বিয়ে করছে কেন? এবার বলুন আপনারা?

বাড়ী ভরতি লোক। সুশান্তের বন্ধুর দল। আমাদের আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপ্রতিবেশীরা। পাড়ার মেয়ে বৌরা।

কেউ কোন কথা বলল না।

বলবে কি? এতো মীরা নয়। এ যে মমতা।

সুশান্তের মামারা ঐত বলছেন,····যাকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গিছিল, কলঙ্কিতা করেছিল, জাতিচ্যুতা আর ধর্মচ্যুতা করেছিল। মীরা যদি এদের সামনে মমতা হয়ে যেতে পারে, তবে মামাদের কথাগুলো সত্যি হতে পারে না কেন?

একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পেলাম।

মনে হল, ওরই মধ্যে কে যেন ঠাট্টার সুর করে খিলখিল শব্দে হাসছে।

কে বুঝি আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমি প্রতারক? মতলববাজ জালিয়াৎ? ষড়যন্ত্রকারী?

না হলে কি উদ্দেশ্যে মুসলমানে ছোঁয়া মেয়েকে নিজের মা'র পেটের বোন বলে চালাতে চেয়েছি? নিজের বাড়ীতে এনে সুশান্তের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি?

কি উদ্দেশ্যে ? কিসের স্বার্থে ?

আমার ভেতরটা ঐ মমতারই মত আর্তনাদ করে উঠল, না, না, না,···এ মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে !

আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল।

আমি ছ'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়লাম।

(কিন্তু সংসারে অনেক সময় এই মিথ্যেটা সত্যটাকে শুধু চাপা দেয় না, বরং নিজেই সত্যের ছদ্মবেশ ধরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, সত্যের মুখোশ পরে সত্যটাকেই গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে।)

সেই রাতে মিথ্যেটার বিরুদ্ধে নিস্ফল উত্তেজনা প্রকাশ করতে গিয়ে মমতা সেই যে বিয়ের পিঁড়িতে জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে পড়েছিল তারপর আর সে কোন কথাই বলতে পারেনি।

কে যেন তার গলাটা চিরদিনের জন্যে টিপে ধরেছিল।

দশবারটা দিন এই রকম অসাড় হয়ে পড়ে রইল সে।

মা তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসেছিলেন। বারবার ডাক্তার এলেন, ওষুধ দিলেন, নানা রকম ইনজেকশান করলেন। তবু কিছুতেই কিছু হল না।

জীবনের লক্ষণটুকু আস্তে আস্তে যেন মুছে যেতে লাগল।

এক সময় আমি অস্থির হয়ে বলে ফেললাম, কিন্তু সুশান্তের একি ব্যবহার ! সেই যে কোথায় ছুটে চলে গেল, আর একবারও ফিরে এল না। তাহলে শেষ পর্যন্ত তার মামাদের প্রমাণটাকে বিশ্বাস করে সেও কি একেবারে চলে গেছে ?

মা'র দিকে তাকালাম। দেখলাম, মা মমতার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমার কথাগুলো শুনেও মা কোন কথা বললেন না।

একটু পরে আমিই আবার বললাম, কিন্তু মা, ডাক্তারবাবু বললেন, এ রুগী বাড়ীতে রাখা চলবে না। মমতাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

মা এবার আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টো জলে ভরে উঠেছে। তবু মা সহজ শান্ত গলায় বললেন, যে মরার পথে এগিয়ে গেছে, তাকে বাঁচাবার নাম করে আর শেষ সময়ে বাড়ী থেকে সরিয়ে দিসনে খোকা। তার চেয়ে ও আমার কোলেই মরুক! মীরাকে জলে ফেলে দিয়ে আসতে পেরেছি, আর এই মেয়েটাকে আগুনের হাতে তুলে দিয়ে আসতে পারব না? ধর্মের নাম দিয়ে এদেশের মানুষগুলো ওদের মত মেয়েদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে, তার চেয়ে আমি না হয় ওকে একবারই চিলুতে তুলে দিয়ে ওকে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে আসব। চোখের সামনে ওর যন্ত্রণাটা অসহায়ভাবে দেখার চেয়ে ওর শেষটুকু নিজের হাতে শেষ করে আমি তৃপ্তি পাব, পরম শান্তি পাব। আমি যে সন্তানের মা, এটা বুঝেও বুঝিস না খোকা!

মায়ের খোকা একথা বোঝে। কিন্তু ঐ সুশান্তের মামারা একথা বোঝে না, বোঝে না পাড়ার পাঁচজন প্রতিবেশী, বুঝতে চায় না আত্মীয়-স্বজন. বুঝতে চায় না সমাজ।

চট করে মনের ভেতরটা ঝিলিক দিয়ে জ্বলে উঠল। কিন্তু সুশান্ত! যে সুশান্ত সব জেনেও, মমতার মুখ থেকে সব শুনেও তাঁকে বাঁচাবার জন্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও কি শেষ পর্যন্ত বুঝতে চায় নি, বিশ্বাস করতে পারেনি?

মনের ভেতরটা অস্থিরভাবে আথালি পাথালি করতে লাগল। প্রাণটা যেন হু হু করে জ্বলতে লাগল!

তবু আমি কি করতে পারি!

আমি মমতার অসাড় দেহটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

মমতা মরে যাবে। আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। এ ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না। আর কিছু না।

আমাদের সমস্ত মমতা ঢেলে মমতাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলাম না।

মা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। আমি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম।

রাতটা শেষ হবার আগেই মমতা শেষ হয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ভাবলাম, যাক, আর মেয়েটার জন্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে না। এখন রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে কলঙ্কের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া মমতাকে ভালয় ভালয় নিয়ে যেতে পারলে নিস্তার পাই।

কি জানি, আবার কোন খাঁটি হিন্দুর বংশধর যদি সনাতন ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য হিন্দুদের নির্দিষ্ট ঘাটে শবদাহের অধিকার নিয়ে আস্ফালন করে বসে ?

ভরসা কোরব কার উপর ? আর বোঝাব কাকে ?

তাইত কাঁদতে সাহস করলাম না, মাকে পর্যন্ত গলা ছেড়ে কাঁদতে দিলাম না। ক'জন বন্ধুকে নিয়ে চোরের মত চুপি চুপি পথে বেরিয়ে গেলাম।

ঘাটের সামনে গেছি কিন্তু তখনো ঘাটের মধ্যে ঢুকিনি।

এমনি সময় শুনতে পেলাম, পেছনদিকে, বেশ খানিকটা দূর

থেকে কে যেন প্রাণপণে চীৎকার করছে,—দাদা, দাদা, দাদা, থামো, একটু থামো।

চীৎকারটা হু হু করে কাছে এগিয়ে আসছে।

সঙ্গীদের বললাম, একটু দাঁড়াত ভাই। কে যেন আমাকে ডাকতে ডাকতে এদিকে দৌড়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

আমরা থামলাম। আমাদের একজন পেছনদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, ঐত, ওদিককার পোষ্টের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একজন নয়, তু'জনলোক ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে।

আমার ভেতরটা ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল, আবার কারা আসছে? আবার কি কোন বাধা আসছে নাকি?

তাহলে?

কিছু ঠিক করতে না পেরে ওদের বললাম, রাস্তার একপাশে খাটটা একটু নামা ভাই। দেখি, আমাদেরই ডাকছে কিনা।

খাটটা নামালাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম।

লোকতুটো ছুটতে ছুটতে আরো কাছে এল। চিনতে পারলাম।

সুশান্ত ছুটে আসছে। ওর সঙ্গে আর একজন লোক।

সুশান্ত!....

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না কিন্তু মনটা টনটন করে উঠল।

কোথায় ছিল এতদিন, এই বারতের দিন?

এরপর কি জন্যে আসছে? মমতা চলে গেছে। তার কথা সুশান্ত বিশ্বাস করেনি বলে চলে গেছে। তবে?

তবে আসুক সুশান্ত। যত ইচ্ছে কলঙ্ক রটাক, প্রাণভরে নিন্দে

করুক। মামাদের অনুরক্ত ভাগ্নে হয়ে জাত আর ধর্মের মান রক্ষা করেছে বলে যত ইচ্ছে গর্ব করুক।

মমতা আর সুশান্তের কথা শুনে উঠে দাঁড়াবে না, আর্তনাদ করবে না, সত্যটাকে বুঝিয়ে বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মূর্ছা যাবে না।

তবে আর কার জন্যে দুর্ভাবনা, কিসের জন্যে এত ভয়? আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালাম।

সুশান্ত ছুটতে ছুটতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল ওরই বয়েসী একজন যুবক।

দাদা!

সুশান্তের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কোন কথাই বললাম না, বলতে পারলামও না।

সুশান্ত পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিল। তবু টেনে টেনে বলল, তুমি জান, মমতাকে বিশ্বাস করেছিলাম বলেই আমি মমতাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। তাইত বিয়ের আসরে আমার মামাদের কুৎসাটাকে মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্যে আমার বিশ্বাসটুকু সম্বল করে বিয়ের পিঁড়ি থেকে ছুটে চলে গিছিলাম। রাগের আর উত্তেজনার ঝোঁকে সেই রাতেই ওপারে ঐ পূর্ববাংলায় চলে গিছিলাম। বিয়ের পিঁড়িতে মমতা পড়ে রইল, সাতপাকের মালা বদল করা হল না, তোমাদের কিছু বলার সময় হল না, এই সমস্ত কিছু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক তাও তখন আমার মাথায় ছিল না। মাথার মধ্যে শুধু এই আবেগ ছিল, এক্ষুণি ওদেশে যাব, মমতার কাছ থেকে তাদের গ্রামের যে কথা শুনেছি, সেই কথামত মমতাদের গ্রামখানা খুঁজে বার করব, আর খুঁজে বার করব তার সেদিনের সেই আত্মাদ

ভাইকে, যে ভাই তাকে রক্ষে করেছিল ধর্মান্ধ মুসলমানদের নরমেধ যজ্ঞের তাণ্ডব থেকে, যে শুধু তার প্রাণটাকে রক্ষে করেনি, তার মান, তার ইজ্জত, তার নারীত্বের পবিত্রতাকে পর্যন্ত রক্ষে করেছিল, যে নিজে ধর্মে মুসলমান হয়েও তার মায়ের পেটের ভায়ের মত আপন হয়েছিল।

সুশান্ত হাঁপাচ্ছিল। সে একটু থেমে খানিকটা দম নিয়ে আবার বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গ্রামখানা সুশান্ত খুঁজে বার করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে বার করেছে আজাদ ভাইকে।

সুশান্ত আজাদ ভাইকে সব কথা, সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছে। মমতার সঙ্গে তার বিয়ের কথা পর্যন্ত, মামাদের মিথ্যে অপবাদ শুনে বিয়ের পিঁড়ি থেকে ছুটে চলে আসা পর্যন্ত। তারপর এক-দিনও তারা অপেক্ষা করেনি। সুশান্ত আর মমতার আজাদ ভাই আবার পথে ছুটে বেরিয়েছে।

সুশান্তের প্রতিজ্ঞা,—সকলের চোখের সামনে আজাদ ভাইকে হাজির করে মামাদের মিথ্যে কলঙ্কের অপবাদ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেবে! আজাদ ভাইএর জিদ্, সে তার বোনের হয়ে এখানে এসে চাক্ষুষ প্রমাণ দেবে!…

তাইত ওরা দু'জনে কলকাতার গাড়ী থেকে নেমে সোজা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছে। মায়ের মুখ থেকে সব ঘটনা শুনেছে। শুনেই আবার ছুটতে ছুটতে এই পথের দিকে আসছে!

দাদা!

চমকে উঠলাম!

কে ডাকে আবার?

আমি আজাদ।

ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম। সেই যুবক।

আজাদ। মমতার সেদিনের আজাদ ভাই!

মমতার ভাই। রক্তের নয় কিন্তু ধর্মের।

ধর্মের ?

মনটা অস্থির হয়ে উঠল, ধর্মে ত আজাদ মুসলমান।

তবে ?

বিচারকের মত শক্ত আর সন্দিগ্ধ মন নিয়ে বললাম, তোমার কথা বিশ্বাস করব কি করে আজাদ ?

আজাদ কি যেন একটু ভাবল। তার হাতে একটা কাপড়ের পুট্‌লী ছিল। তারপরেই সেই পুট্‌লীটা চটপট খুলে ফেলে তার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট রঙিন জামা আর পায়ের পাতার উপর পর্যন্ত ঢাকা একটা চুড়িদার সালোয়ায় বার করল। জামা আর সালোয়ারটা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে মমতার খাটখানার দিকে তাকিয়ে কাতরস্বরে বলল, বোন্‌ডি, তুমি যখন ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে, তখন বাপজান বলেছিল, খোদাতালা বলেন, যে প্রাণের ভয়ে তোমার আশ্রয় নেবে, তাকে তুমি নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষে করবে।

বাপজানের কথা শুনে আমি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খোদা-তালার কাছে দোয়া মেগেছিলাম. খোদা, আমি যেন আমার বিপন্ন বোনকে বাঁচাতে পারি, তার প্রাণ বাঁচাতে পারি, ইজ্জত বাঁচাতে পারি।

তাই তোমার প্রাণ আর ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে আমি হাটের দোকান থেকে মুসলমানী সালোয়ার আর জামা করে আনলাম। তোমাকে মুসলমান মেয়ের পোষাকে সাজিয়ে দিলাম। গাঁয়ের মানুষ জিজ্ঞেস করলে, ওদের বললাম, আমার ফুপুর মেয়ে, ফরিদপুর থেকে বেড়াতে এসেছে, গণ্ডগোল মিটলে বাড়ী ফিরে যাবে।

পোষ্টের আলোয় দেখতে পেলাম, আজাদ ভাইএর চোখ দুটোতে জল মুক্তোর মত টলমল করছে।

আজাদ কাঁপা গলায় আবার বলল, আজাদভাই তার কসম রেখেছিল বোন্‌ডি, তোমাকে হিন্দুস্থানের সীমানার কাছে দিয়ে গিয়েছিল, আর তোমার নিজের জামা পরিয়ে দিয়ে তার দেওয়া পোষাক ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ভেবে আনন্দ পেয়েছিল, ভায়ের কাছে বোনের পোষাকটা স্মৃতি হয়ে তোলা থাকবে।

একটু থামল আজাদ। একটা হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার বলল, বোন্‌ডি, খোদার তা ইচ্ছে নয়। তাইত তোমার নিজের ধর্মের মানুষের হাতে তোমার অপবাদের কথা শুনে, তোমার নামে মিথ্যে কলঙ্কের বদনাম রটেছে জেনে তোমার আজাদ ভাই ছুটে এসেছে, বোনের কলঙ্কের ছাপ দূর করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে গোপনে পাকিস্তানের সীমানা টপকে অস্থির হয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

কিন্তু সে ছুটে এসে এ কি দেখছে ?

দেখছে, সেদিনের বোন্‌ডি আমার মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে একলা চলে গেছে।

তবে আর আজাদ ভাই কি করতে পারে ?

এরপরে এই সালোয়ার জামাটা দেখিয়ে আর কার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে আজাদ মিঞা অবিশ্বাসী হিন্দুর কাছে প্রমাণ দিতে এগিয়ে যেতে পারে ?

আজাদভাই বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ভিজে গলা যেন উত্তেজনার একটা তীব্র উত্তাপে শুকিয়ে গেল। সে নীরস তপ্তস্বরে বলল, নইলে আমি মাথা উঁচু করে বুকে থাপ্পড় মেরে বলতাম,—আমি মুসলমানের ছেলে, আমি সর্বদর্শী খোদার

নাম করে বলছি, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। খোদার নামে কসম করে মুসলমানের ছেলে মিথ্যে কথা বলে না!

নিঃসাড় নিস্তব্ধ রাতে আজাদের কণ্ঠস্বর ঝনঝন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি তবুও বেশ শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বললাম, কিন্তু আমি হিন্দুর ছেলে! একটা হিন্দুর মেয়ের জন্যে একজন মুসলমানের ছেলের এই শপথ আমি মেনে নিতে পারি না।

আজাদ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমিও তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সোজা হয়ে, অচঞ্চল অপলক দৃষ্টি মেলে।

এমনি করে কতক্ষণ আমরা দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, জানি না।

কিন্তু একসময়ে দেখতে পেলাম, আজাদের চোখের চাহনীটা একটু একটু করে নরম হয়ে এল। তার স্থির চোখদুটো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, তার নীরস গলার স্বরটা আবার জলে ভিজে গেল।

দাদা!...

আমি তখনো দৃঢ়ভাবে বললাম, তবে কি করে বিশ্বাস করব আজাদ?

এবার একটা উদ্দাম বন্যার মত কান্নামাখান স্বর ছুটে এল, তুমি মমতার দাদা, তাই আমারও দাদা। তুমি বিশ্বাস কর, আজাদও বাঙালীর ছেলে! ধর্মে তুমি আর আমি তফাত হতে পারি, কিন্তু জাতে তুমিও যা আমিও তাই। তুমি আর আমি এক। বাঙালী। একই মাটির মানুষ। বাঙালী হয়ে বাঙলার

ছেলে আজাদ তার বোনের নামে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। আজাদ জানোয়ার নয়, আজাদ মানুষ!

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আজাদ!

সালোয়ার আর ইজেরটা আমাদের সামনে ছুড়ে ফেলে দিল। আবার বলল, এরপর বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। তবে ফিরে যাবার সময় স্পষ্ট করে বলে যাচ্ছি, যে ধর্মে মরার পরেও মা-বোনের জীবনের কলঙ্ক নিয়ে সত্যমিথ্যার চুলচেরা বিচার করতে চায়, তাকে পথে বার করেও তার ইজ্জতের হাতেনাতে পরীক্ষা কতে চায়, সেই ধর্মের কবল থেকে মমতাকে বাঁচাবার জন্যে আজাদভাই যদি সেদিন, সেই দুঃসময়ে তাকে নিজের ঘরে, নিজের ধর্মে চিরজীবন ধরে রাখত, তাহলে হিন্দুর চোখে নিষ্ঠুর শয়তান বলে গণ্য হত কিন্তু ন্যায়বিচারক মহান আল্লাতালার চোখে একটা খাঁটি মানুষ বলেই প্রমাণ দিত।

আর দাঁড়াল না আজাদ ভাই।

পেছন ফিরে ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

দূরের অস্পষ্ট আলোয় তার ছায়াটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

প্রায় দুপুর। মাথার উপর সূর্য জ্বলজ্বল করছে। গঙ্গার জল আলোয় চকচক করছে। সঙ্গীরা ডুব দেবার জন্যে জলে নেমে গেল।

আমি স্নানের ঘাট থেকে খানিকটা তফাতে চলে গেলাম। বুঝতে পারলাম সুশান্ত আমার পেছনে পেছনে আসছে।

চিতার ছাইথেকে মমতার একটুকরো হাড় খুঁজে এনেছিলাম।

খানিকটা নরমমাটি তুলে হাড়টাকে বেশ করে ঢাকা দিয়ে একটা দলা করলাম।

মা বলে দিয়েছিলেন, এইভাবে মমতার শেষ অস্থিটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিতে হবে।

আঘাটায় এসে আমি একপা একপা করে জলের মধ্যে নেমে গেলাম।

পেছনথেকে জলের শব্দ পেলাম না। বুঝলাম, সুশান্ত জলে নামেনি।

ঘুরে তাকালাম না। (কিন্তু সুশান্তের ভিজে গলার কথা শুনতে পেলাম, দাদা, পাপ বা দুর্বলতা আমার মনে ছিল। নইলে মামাদের চক্রান্তটাকে মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্যে কেন আমি তখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আজাদ ভাইএর সন্ধানে ছুটে চলে গিছিলাম, তখন বিয়ের পিঁড়িতে বসে থাকা মমতার অসহায় অবস্থার কথাটা একবারও ভাবলাম না কেন? এখন বুঝতে পেরেছি, আমার ওই ছুটে যাওয়টা মমতার জীবনের মিথ্যে কলঙ্কটাকে ঘুচিয়ে দেবার জেদ নয়, ওটা আমার নিজের মনের চাপা সন্দেহের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার একটা অক্ষম উত্তেজনা। আমি স্বীকার করছি, শুধু আমার গোঁড়া মামারা নন, লেখাপড়া শিখে সংস্কার মুক্ত হয়েছি ভেবে অহঙ্কার করেও আমিও শেষপর্যন্ত মমতার নিষ্কলঙ্ক জীবনটাকে নিয়ে কেবল যেন খেলাই করেছি।)

সুশান্তের কথাগুলো চুপ করে শুনলাম। আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। কিন্তু ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমিও মনে মনে স্বীকার করলাম, বাইরে শিক্ষিত বলে, নিজেকে কুসংস্কার বা গোঁড়ামিশূন্য মনে করে, মনে মনে যতই গর্ব করিনা কেন

যুগযুগ সঞ্চিত সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের বিষধর সাপটা এখনো সুযোগ পেলে মনের ভেতরের অন্ধকারে লুকোনো গর্ত থেকে সাঁ করে ফণা তুলে বেরিয়ে আসে, সত্যমিথ্যা যাচাই করবার দোহাই দিয়ে এখনো আমাদের সহজ বিচারবুদ্ধিকে ছোবল মারতে চায়। নইলে আমিই বা কেন আজাদ ভাইকে কড়া কড়া প্রশ্ন করতে গিছিলাম? শুধু কি মমতার নিষ্কলঙ্কতার প্রমাণটা নিতে, কিম্বা ঐ নিষ্পাপ নির্দোষী অসহায় মেয়েটার মরা দেহটাকে সামনে রেখে সন্ধানী প্রশ্নগুলোর ছল করে নিজের মনের ছায়াভরা অস্পষ্ট সন্দেহটাকে ছলনা করতে? প্রশ্নটার হঠাৎ কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না, কিন্তু নিজের ভেতরে নিজেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

বারবার কেবলই মনে হতে লাগল, অপরাধ আমরাও করেছি। আমরা, যারা লেখাপড়া শিখে আর পাঁচটা আধুনিক মতবাদ চর্চা করে উদার হয়েছি, কুসংস্কার মুক্ত হয়েছি বলে বাইরে গর্ব করি, পথেঘাটে নিজেদের সংস্কার মুক্তির আদর্শ দেখাবার জন্যে আত্মপ্রচার করি। তা'না হলে শুধু কতকগুলো পুরাতনপন্থী অন্ধ মানুষের গোঁড়ামিতে প্রতিমারা ফতিমা হতে বাধ্য হত না, লতাদিদি অসুস্থ আর পাগল স্বামীকে নিয়ে পরিত্যক্ত অসহায় জীবন যাপন করত না, মমতার মত মেয়েরা বিয়ের পিঁড়িতে বসেও মরণের কোলে ঢলে পড়ত না!

আমি আহত ক্ষতবিক্ষত অন্তর নিয়ে জলের ভিতরে এগিয়ে যাই।

* * * *

কোমর জলে এসে দাঁড়ালাম। সামনের দিকে তাকিয়ে মমতার

সেই একটুকরো অস্থি দু'হাতের মুঠোয় তুলে ধরে বললাম, মাগো, মমতাকে মীরা নাম দিয়ে তোমার কাছ থেকে কেড়ে এনেছি মনে করে অহঙ্কার করেছিলাম। কিন্তু তখন বুঝিনি, এই দেশে, এই সমাজের মধ্যে বাস করে এতবড় অহঙ্কার করবার শক্তি আমার নেই। তাই আজ আবার মাথা নীচু করে তোমার কোলে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।

হতভাগীকে আর একবার আশ্রয় দাও মা!

ছোট ছোট ঢেউগুলো এসে আমার হাতে ছড়িয়ে পড়ল; মাটি-মাখা অস্থির টুকরোটা জলের ভেতর গড়িয়ে পড়ল।

'আমার কথাটি ফুরোল